মাসুদ রানা

ভাইরাস X-99

কাজী আনোয়ার হোসেন

ছয়শো পাউন্ড ওজন নিয়ে জাপানি কুস্তিগির বিয়াংশিকে
জলজ্যান্ত একটা ঘটনাই বলা যেতে পারে।
কবীর চৌধুরী তার হাতে যে ভাইরাসটা তুলে দিয়েছে,
গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত একশো তেইশজন রাষ্ট্রপ্রধানকে
তা দশ মিনিটের মধ্যে খুন করবে, নিউ ইয়র্ক থেকে সংক্রমিত
হতে হতে আপনার কাছে—হ্যাঁ, আপনার কাছে—
পৌঁছাতে সময় লাগবে দেড়শো ঘণ্টার কিছু বেশি। তাই
এবারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো
মাসুদ রানা কি আপনাকে রক্ষা করতে পারবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

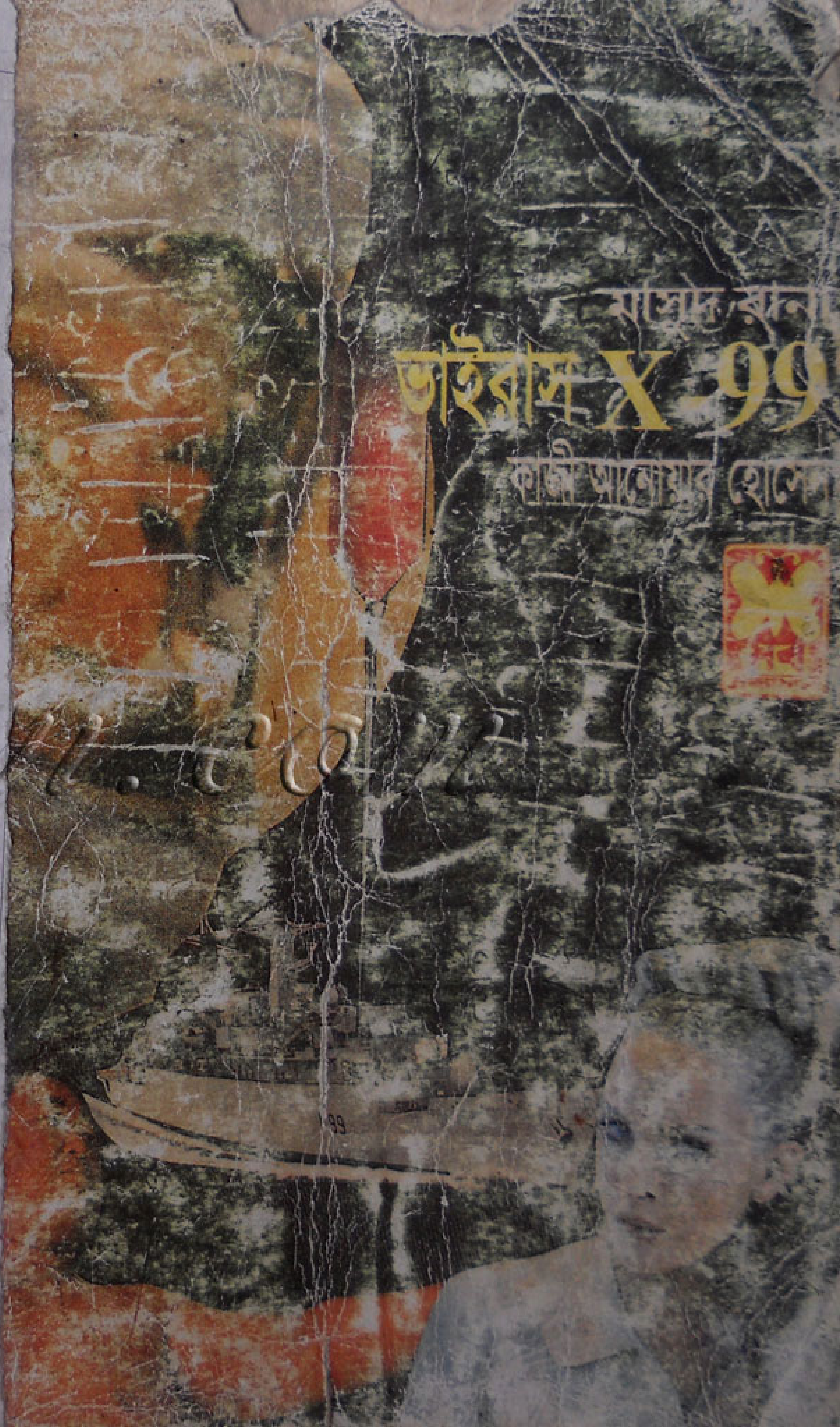

grohon.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর ★শ্বাপদ সংকুল★দংশন ★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা ★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু ★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ★কুহেলি রাত★বিষাক্ত থাবা★জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি★সেই পাগল বৈজ্ঞানিক★সার্বিয়া চক্রান্ত★দুরভিসন্ধি★কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী ★ পালাও, রানা! ★ দেশপ্রেম★ রক্তলালসা ★ বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয়।

এক

সর্বসাধারণ নাগাল পাবে না, এমন কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখতে হলে এরচেয়ে দুর্গম ও নিরাপদ জায়গা আর হয় না। কেন্টাকি ও ভার্জিনিয়া, এই দুই রাজ্য যেখানে কাঁধে কাঁধ ঘষছে; অর্থাৎ কামবারল্যান্ড পর্বতশ্রেণী।

চারদিকে আদিগন্ত স্থির হয়ে আছে মাটি ও পাথরের ঢেউ, মাঝখানে সাতশো ফুট চওড়া কামবারল্যান্ড ক্যানিয়ন। খাদটা আটশো ফুট গভীর, কিনারা থেকে ঝপ করে নিচে নেমে গেছে গা, লম্বায় মাইল পাঁচেক। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে গরুখোঁজা করলে দু'চারটে বাড়ি-ঘর পাওয়া যেতে পারে, শত অসুবিধে অগ্রাহ্য করে বসবাস করছিল হাতে গোনা কয়েকজন প্রকৃতি-প্রেমিক।

ক্যানিয়নের উত্তরে বড় একটা পাহাড়। সমতল চূড়ায় ওঠার জন্যে প্যাঁচানো একটা রাস্তা ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, ওই রাস্তা ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে—পাঁচশো, হাজার, দেড় হাজার ও দু'হাজার ফুটে। সৃষ্টিছাড়া এই কাণ্ড দেখে প্রকৃতি-প্রেমিকরা অশুভ কিছু একটা আঁচ করতে পেরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, বলাই বাহুল্য যে তাদের বাড়ি-ঘরে এখন ঘুঘু চরে।

শুধু একদিকে গভীর খাদ আছে বলে নয়, বাকি তিনদিকের গঠনপ্রকৃতিও পাহাড়ের চূড়াটাকে দুর্ভেদ্য দুর্গের বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে; পুবে আরও খানিক উঁচু একটা পাহাড়ের খাড়া গা, পশ্চিমে প্রকৃতির তৈরি সরু ও অগভীর একটা পরিখা—বর্ষার সময়

সেখানে পানি জমে--উত্তরে ছিল্ ঢাল ও রাস্তা, ডিনামাইট ফাটিয়ে প্রথমে রাস্তাটাকে ধ্বংস করা হয়েছে, তারপর পাশের লাগোয়া একটা পাহাড় থেকে বোল্ডার ধস ঘটিয়ে ঢালটাকে পরিণত করা হয়েছে দুস্তর পাথরের রাজ্যে। আকাশ-পথ ছাড়া কার সাধ্য এই চূড়ায় পৌঁছায়!

সমতল চূড়াটা লম্বা ও চওড়ায় কমবেশি চারশো গজ। পুরো জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ভেতরে ও বাইরে স্পর্শকাতর সেনসর ছড়ানো আছে, এমনকি গিরগিটি ও খরগোশের উপস্থিতিও টের পেয়ে সংকেত পাঠাতে পারবে। ক্যামেরাও বাদ যায়নি, চূড়ার চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে সব দেখা যাবে কন্ট্রোল রুমের মনিটরে।

কাঁটাতারের বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড ও অবিচ্ছিন্ন; পাহাড় থেকে নামার কোন পথ না থাকায় কম্পাউন্ড থেকে বেরুবার জন্যে কোন গেট রাখা হয়নি। একশো ফুট উঁচু একটাই ওয়াচটাওয়ার, চোখে বিনকিউলার সেঁটে দু'জন গার্ড সারাক্ষণ চারপাশের পাহাড়গুলোর ওপর নজর রাখছে। তিনটে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের একটা বসানো হয়েছে ওখানে। বাকি দুটো জেনারেটর হাউজিং ও মূল রিপজিটরি বিল্ডিঙের ছাদে।

মূল দালান তিনতলা, কমপাউন্ডের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ অর্থাৎ খাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। পুবে, দুশো গজ দূরে, এক সারিতে কয়েকটা কটেজ; প্রথমটায় বিজ্ঞানীরা, দ্বিতীয়টায় সিকিউরিটি অফিসাররা, তৃতীয়টায় অন্যান্য স্টাফ থাকে। রিপজিটরি বিল্ডিং ও আবাসিক এলাকার মাঝখানে দুটো চেক পোস্ট। ডিউটি থাক বা না থাক, পরিচিত হোক বা না হোক, চেক পোস্টে সবাইকেই প্রতিবার পরিচয়-পত্র ও সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স দেখাতে হবে, এই ঝামেলা এড়াবার সুযোগ এমনকি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বিজ্ঞানী ক্লিনটন ডিউইট বা কমপাউন্ড কমান্ডার জেনারেল জেমস ওয়েদারবাই-এরও নেই।

দুটো হেলিপ্যাড, দুটোই পুবদিকে; কটেজগুলোর সামনে। দুটো হেলিপ্যাডে একসঙ্গে চারটে হেলিকপ্টার নামতে বা উঠতে পারে। কখন কি ইমার্জেন্সী দেখা দেয়, তাই দুটো কপ্টার সব সময় কমপাউন্ডে থাকবেই। যদি কখনও এমন হয় যে হেলিপ্যাড খালি নেই, এই সময় রসদ বা অন্য কিছু নিয়ে আরও এক বা একাধিক কপ্টার চলে এল, তখন হেলিপ্যাড খালি করে দিয়ে আকাশে চক্কর মারতে থাকে পাইলটরা, সদ্য আগত সঙ্গীদের কার্গো বা আরোহী নামাবার সুযোগ করে দেয়।

কামবারল্যান্ড রিপজিটরিতে শুধু মার্কিন এয়ারফোর্স-এর হেলিকপ্টার আসা-যাওয়া করে। যে-দুটো হেলিকপ্টার সবসময় হেলিপ্যাডে থাকে, তার একটা রকেট ও কামান সজ্জিত গানশিপ।

রোববার ছুটির দিন শান্ত ও নিস্তব্ধ এক বিকেলে নির্মম হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু হলো বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা নিয়ে সঙ্কট ও টানাপোড়েন। তিনতলা রিপজিটরি বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক, কর্নেল জেরাল্ড বসওয়েল তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। সৈনিকরা জানে, কটেজ থেকে আসার পথে দুই চেক পোস্টেই কর্নেলকে থামিয়ে কাগজ-পত্র দেখতে চাওয়া হয়েছে, কমপাউন্ডের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হওয়ায় তাঁকে কোন রকম ছাড় দেয়া হয়নি; বরং সবাই জানে যে ছাড় দেবে তারই চাকরি খাবেন স্বয়ং বসওয়েল। স্মার্ট ভঙ্গিতে স্যালুট করল দুই প্রাইভেট, সাড়া দেয়ার মধ্যে কর্নেলের ক্ষিপ্রতা লক্ষ করার মত। রোববারে কোন কাজ থাকে না, একঘেয়ে সময় কাটানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাই দু'এক ঘণ্টা পরপর গোটা কমপাউন্ডে একটা করে চক্কর দিয়ে আসেন বসওয়েল। এইমাত্র টহল থেকেই ফিরলেন, তবে আজ তাঁকে একঘেয়েমির শিকার বলা যাবে না। যাবার সময় আজকের দৈনিকটা ভাঁজ করে বগলের তলায় রেখেছিলেন, এখনও সেটাকে একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে।

স্যালুট করার পর কর্নেলের পথ ছাড়ছে না সৈনিকরা। পকেট

grohon.com

grohon.com

থেকে কাগজ-পত্র বের করে তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন বসওয়েল, তারপর অভ্যাসবশত দরজার দিকে পিছন ফিরে স্থির ও নিস্তব্ধ কমপাউন্ডের ওপর চোখ বোলালেন। টহল দেয়ার সময় কোথাও কোন অসঙ্গতি চোখে পড়েনি, কাজেই মনটা তাঁর শান্ত থাকারই কথা, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করছেন কর্নেল।

কমপাউন্ডের ভেতর আরও কয়েক প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া আছে, মূল রিপজিটরি বিল্ডিং থেকে দুটো চেক পোস্ট, হেলিপ্যাড, ওয়াচ টাওয়ার ও কটেজগুলোকে আলাদা করে রেখেছে। ছুটির দিন বলে নয়, বিজ্ঞানী আর তাঁদের সহকারীরা শুক্রবার থেকেই কামবারল্যান্ড ত্যাগ করে ওয়াশিংটনে থাকছেন বিশেষ একটা সেমিনার উপলক্ষে। পরিবেশ বোধহয় সেজন্যেই বড় বেশি শান্ত আর নিস্তব্ধ লাগছে। কোন ঝড়ের পূর্বাভাস নয় তো? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

কাগজ-পত্র ফিরিয়ে নিয়ে দালানের ভেতর ঢুকলেন। দুধের মত ধবধবে সাদা বিশাল হলরুম, হলরুম থেকে করিডরগুলো বিভিন্ন দিকে চলে গেছে, প্রতিটির শেষ মাথায় একটা করে ল্যাবরেটরি। তাঁর অফিস তিনতলায়, সিঁড়িতে পা রাখার আগে ইস্পাতের চকচকে একটা দরজার সামনে দাঁড়ালেন কর্নেল, দরজার গায়ে লাল প্লাস্টিকের হরফে লেখা রয়েছেঃ 'রেসট্রিক্টেড-অথরাইজড্ পারসোনেল ওনলি'। ছোট্ট কাঁচের জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালেন। দু'জন সৈনিক শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রাইফেল, কোমরের হোলস্টারে পিস্তল। ওদের পিছনে ইস্পাতের আরও একটা দরজা, তবে এটায় কোন জানালা নেই, শুধু সরু একটা ফাটল আছে। ওই দরজাও বন্ধ। ডিউটিরত সৈনিক দু'জন হলো সার্জেন্ট হল ও করপোরাল ড্রেক। জানালার কাঁচে কর্নেলের মুখ চিনতে পারলেও ঠাণ্ডা ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তারা, হাবভাব অনেকটাই

চ্যালেঞ্জ করার মত।

ঘুরলেন বসওয়েল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন নিজের অফিসে। জেনারেল ওয়েদারবাই কমপাউন্ডের কমান্ডার হলেও, তিনি ওয়াশিংটনে চলে যাবার পর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কর্নেল বসওয়েলই এখন দায়িত্বে আছেন। বোধহয় এই গুরুদায়িত্বের কারণেই নার্ভাস ও অস্থিরতা বোধ করছেন তিনি।

ডেস্কে কাগজের ভাঁজ খুলে খবরটা আবার একবার পড়তে শুরু করলেন বসওয়েল। দৈনিকটা আজ যতবার খুলছেন, প্রধান শিরোনামটা যেন লাফ দিয়ে উঠে আসছে চোখে। -

আন্তর্জাতিক ব্যাকটিরিয়োলজিস্টদের সম্মেলন
ভাইরাস উৎপাদন ও সংরক্ষণ একটি সম্ভাব্য ইস্যু

খবরটা পড়ার সময় কর্নেলের মুখে এক চিলতে গম্ভীর হাসি ফুটল।

'রাজধানীতে শুরু হওয়া ব্যাকটিরিয়োলজিস্টদের আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে জীবাণুযুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য মারাত্মক ভাইরাস-এর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন যে এই সব ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা আজও মানুষ অর্জন করতে পারেনি। সরকারের অন্যতম প্রধান ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট ড. ক্লিনটন ডিউইট এ-ধরনের ভাইরাস উৎপাদন ও সংরক্ষণকে বিশ্ব শান্তির জন্যে মারাত্মক হুমকি বলে অভিহিত করেছেন। এর উৎপাদন ও মজুদ এখুনি বন্ধ করার জোরাল দাবি জানিয়েছেন তিনি। সরকারী মুখপাত্র অবশ্য এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে আতঙ্কিত হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই, এবং দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে এ-ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।'

কর্নেল বসওয়েলের মুখে গম্ভীর হাসি আরও একটু চওড়া হলো। সরকারী মুখপাত্র ঠিক কথাই বলেছে। মূল দালানে তো দূরের কথা, বিনা অনুমতিতে এমন কি একটা পোকারও সাধ্য

নেই যে কমপাউন্ডের ভেতর ঢোকে। পাতা উল্টে খেলার খবরে মন দিলেন তিনি। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বোয়িং প্লেনটার রোজকার গর্জন আজও তাঁকে খুব বিরক্ত করল।

মূল দালানের নিচতলা। সার্জেন্ট হল ও করপোরাল ড্রেক ছোট জানালার ভেতর থেকে দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছে। ভদ্রলোক খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঋজু, চুল-দাড়ি সব ধবধবে সাদা। দু'জনের কাছেই অতি পরিচিত মানুষ তিনি, দু'জনেই জানে এই দরজার সামনে পৌঁছাবার আগে দুটো চেক পোস্ট পেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে, তবু আইডি ও সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স পাস পরীক্ষা করার জন্যে ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তারা।

পক্বকেশ প্রৌঢ়ের পিছনে একটা পাহাড়, যে পাহাড় একজন মানুষের মত নড়াচড়া করে, সব মিলিয়ে প্রায় ছ'শো পাউন্ড ওজন। সার্জেন্ট হল ধারণা করল, এ জাপানি পাহাড় একসময় নির্ঘাত সুমো কুস্তিগীর ছিল। তবে পাহাড় নয়, সার্জেন্টের মনোযোগ কেড়ে নিলেন তার পাশে হুইল চেয়ারে বসা দ্বিতীয় আইনস্টাইন। আসলে দুজনের চেহারায় মিলগুলো এতবেশি যে ভূত দেখার মত চমকে ওঠারই কথা। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ধীরে ধীরে অমিলগুলোও ধরা পড়ে। মাথার দু'পাশে অল্প কিছু উষ্কখুষ্ক চুল, মাঝখানে টাক, বড় বড় চোখে ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি, উন্নত ললাট, কাঁচা-পাকা ভুরু, চওড়া ও ঘন গোঁফ—এ সবই জগদ্বিখ্যাত আলবার্টের সঙ্গে বদলে নেয়া যায়। হুইল চেয়ারটা অত্যাধুনিক—গদি মোড়া আসন, চওড়া পাদানি, ছোট-বড় চারটে চাকা, এক গাদা টিউব ও পাইপ, গিয়ার বক্স, কমপিউটর, ব্যাটারি কেসিং ইত্যাদির সমষ্টি; সব মিলিয়ে ছোটখাট একটা গাড়িই বলা যায়। দরজার চৌকাঠ, সিঁড়ির ধাপ অনায়াসে পার হতে পারে। পানিতে নামিয়ে দিলেও ডুববে না। কমপিউটর আরও অনেক কিছুর মত অটো-পাইলটের ভূমিকাও পালন করতে পারে। আসনে আসীন ভদ্রলোকের সঙ্গে আইনস্টাইনের অমিল হলো, দাঁড়াতে পারলে তাঁর চেয়ে আধহাত বেশি লম্বা হবেন ইনি। চকচকে ও প্রায় পিচ্ছিল কাপড়ের সাদা সুট পরে আছেন, টাইটা টকটকে লাল; হাতলে হাত রেখে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন যেন কোন বিজনেস ম্যাগনেট; এগুলোর কোনটাই আইনস্টাইন সুলভ নয়।

সুমো কুস্তিগীর ও হুইল চেয়ারের পিছনে ছোটখাট আরেকজন জাপানি ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছে সার্জেন্ট হল। তাকে অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর বলা যেতে পারে—নাকের ডগা থেকে চশমাটা যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কোটের বোতাম এক ঘর বাদ দিয়ে লাগানো হয়েছে, মাথার ক্যাপটা উল্টো করে পরা।

দরজা খুলে শুধু ড. ক্লিনটন ডিউইটকে ভেতরে ঢুকতে দিল সার্জেন্ট। ছোট্ট অ্যান্টিরুমে মাত্র একটা পা রাখলেন তিনি।

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বললেন প্রধান বিজ্ঞানী। 'আমরা রিপজিটরি এরিয়া ভিজিট করতে চাই। তুমি ভেতরের গার্ডদের বলবে আমাদেরকে যাতে ঢুকতে দেয়, প্লীজ?'

'আপনার সঙ্গে যারা রয়েছেন, এঁদের কি রেস্ট্রিকটেড এরিয়ায় ঢোকার ক্লিয়ার্যান্স আছে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট। করপোরাল ড্রেক পিছিয়ে গেল, হাতের রাইফেল আগের চেয়ে শক্ত করে ধরে আছে।

'ওঁরা আমার বন্ধু,' হাসলেন বিজ্ঞানী। 'ওঁদের সঙ্গে ভিজিটর'স পাস আর জেনারেল সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স আছে।' তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে তিনজনই নিজ নিজ কাগজ-পত্র বের করল।

ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলল সার্জেন্ট। ডায়াল করার প্রয়োজন নেই, তিনতলার জানালাবিহীন একটা অফিস কামরার বেল বাজতে শুরু করেছে, যে কামরায় সবেমাত্র খেলার

grohon.com

খবর পড়া শেষ করেছেন কর্নেল বসওয়েল। 'আমাদের দরজায় ড. ক্লিনটন ডিউইট, স্যার,' বলল সার্জেন্ট। 'তাঁর সঙ্গে তিনজন ভিজিটর রয়েছেন। ওঁদেরকে নিয়ে রিপজিটরি এরিয়ায় যেতে চাইছেন উনি।' এক মুহূর্ত থামল সে, তারপর আবার বলল, 'না, স্যার, শুধু জেনারেল ভিজিটর'স ক্লিয়ার‍্যান্স আছে।'

'আমি কর্নেলের সঙ্গে কথা বলব,' ড. ডিউইট বললেন।

ফোনের রিসিভার তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল সার্জেন্ট।

'কর্নেল বসওয়েল,' রিসিভারে বললেন ড. ডিউইট, 'আমার সঙ্গে দু'জন জাপানি ও একজন ল্যাটিন আমেরিকান ভিজিটিং ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট রয়েছেন। তিনজনই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, ওয়াশিংটন সিম্পোজিয়ামে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। আরে, আপনি তো সব জানেনই। আসলে রেসট্রিক্টেড এরিয়ার পার্সোনেল ক্লিয়ার‍্যান্স সংগ্রহ করার কথা আমার মনেই ছিল না, তবে ওঁদের পক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিতে পারি। আমিই তো ওদের জেনারেল ক্লিয়ার‍্যান্স সই করেছি, তাই না?' হেসে উঠলেন তিনি, সংক্ষিপ্ত সেই হাসিতে প্রচুর পরিমাণে কৌতুক ও সরলতাই প্রকাশ পেল। 'সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিলাম, কর্নেল। এমনই ভুলো মন যে ওয়াশিংটনে জেনারেল ওয়েদারবাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া সত্ত্বেও ক্লিয়ার‍্যান্স-এর কথাটা মাথাতেই আসেনি। ভেবে দেখুন, এখন যদি দরজা থেকে আমার বন্ধুদের ফিরে যেতে হয়, আমার জন্যে ব্যাপারটা কি রকম বিব্রতকর হবে!'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ড. ডিউইট,' বিড়বিড় করলেন কর্নেল। আরে দূর ছাই, মনে মনে নিজের প্রতি বিরক্ত হলেন কর্নেল, ড. ডিউইট এই প্রতিষ্ঠানের সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর! তাঁরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা রিপজিটরি এরিয়া কি রকম বিপজ্জনক, কি করলে ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ে। তাছাড়া, ভেতরে আরও দু'জন সশস্ত্র গার্ড আছে। 'আপনি সার্জেন্টকে ফোন দিন, প্লীজ,'

অবশেষে বললেন তিনি।

সার্জেন্ট হল অত্যন্ত সাবধানী লোক, কর্নেলের নির্দেশ দ্বিতীয়বার শুনতে চাইল, শোনার পর ক্রেডলে রিসিভার রেখে ইস্পাতের দ্বিতীয় দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ভেতরে যারা আছে তারা শুধু সাংকেতিক ভাষায় নির্দেশ পেলে সাড়া দেবে। সার্জেন্ট হল কয়েকটা সংখ্যা আওড়াল।

একটু পরেই একজন সৈনিক দরজা খুলে দিল, কোমরের হোলস্টারে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ড. ডিউইট আর তাঁর বন্ধুরা রিপজিটরি এরিয়ায় ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল গার্ড।

ড. ডিউইট তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটা করিডর ধরে এগোলেন। করিডরের দু'পাশে মেঝে থেকে ছ'ফুট উঁচু শেলফ রয়েছে, সেই শেলফে সারি সারি সাজানো ছোট আকারের ইস্পাতের বাক্স, দেখতে সিগার বক্সের মত, প্রতিটির শরীর ইস্পাতের পাত দিয়ে শক্তভাবে জড়ানো এবং তালা দেয়া। বাক্সগুলোর পাশে একটা করে চার্ট আছে, পড়লেই জানা যাবে কি আছে ভেতরে।

'ওখানকার একটা বাক্স নিয়ে কমপাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, সিনর বেরেরা,' হুইল চেয়ারে বসা বিজ্ঞানীকে বললেন ড. ডিউইট। 'বের করতে হলে তিনটে সই লাগবে—কমান্ডিং অফিসার, ব্যাকটিরিয়াল ওঅরফেয়ার সেকশন টেন-এর প্রধান ও জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফের।'

ড. ডিউইট খোপ থেকে একটা বাক্স বের করলেন। চোখের কোণ দিয়ে দেখালেন, করিডরের দুই প্রান্তে দাঁড়ানো সৈনিক দু'জন যে যার অস্ত্রে হাত দিল। নিঃশব্দে হেসে বাক্সটা আবার খোপে ভরে রাখলেন তিনি।

'ওদের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে,' হুইল চেয়ার থেকে বললেন ড. ডিউইটের বন্ধু। 'তবে এই ভেবে সান্ত্বনা বোধ করছি যে

সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির বিলোপ সাধনে কোন অপরাধ নেই।'

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, সিনর বেরেরা,' সায় দিলেন ড. ডিউইট, জবাব দেয়ার সময় বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব গোপন থাকল না।

মাংসের বিশাল পাহাড় কিয়াংশি অলস পায়ে করিডরের শেষ মাথার দিকে হাঁটা ধরল। ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল সে। করিডরের আরেকদিকে এগোল হুইল চেয়ার, চেয়ারের পিছু নিয়েছেন ড. ডিউইট। চেয়ারটার পাশে হাঁটছে খর্বকায় জাপানি ইয়াকোমো।

করিডরের দুই প্রান্তে দুই সৈনিকের সামনে থামল জাপানি দু'জন। প্রায় একযোগে হাত তুলে সময় দেখল তারা।

হুইল চেয়ারে বসা বিজ্ঞানী বেরেরা একদৃষ্টে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল, হাতঘড়ি থেকে চোখ ও চেয়ার থেকে শরীর তুলে সিধে হলো সে। এটাই সংকেত।

ঠোঁটে এখনও মিষ্টি হাসি, মাংসের পাহাড় একটা হাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো সৈনিকের গলা চেপে ধরল। আঙুল সহ হাতটা এত বড়, পুরোটা গলা তার ভেতর আটকা পড়ল। ঠিক জায়গা মত চাপ ও মোচড় দেয়ায় তার হাতে আধমিনিটের মধ্যে মারা গেল গার্ড।

ওই একই মুহূর্তে খর্বকায় জাপানি ইয়াকোমো দ্বিতীয় সৈনিকের নাভিতে ঘ্যাচ করে একটা ছোরা ঢুকিয়ে ফলাটা ওপরদিকে টেনে বুকের হাড় পর্যন্ত তুলল, কলকল করে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোত অগ্রাহ্য করে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আলিঙ্গন করল লাশটাকে। খুনীর পাশে দাঁড়িয়ে হাতের কাজটা চাক্ষুষ করল বেরেরা, তার বিষণ্ণ চোখে সামান্য হলেও প্রশংসার ভাব দেখা গেল। তারপর হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে ড. ডিউইটের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল।

ওই ঠাণ্ডা দৃষ্টি জাদুর মত কাজ করল। অকস্মাৎ ব্যস্ত হয়ে

উঠলেন ড. ডিউইট। 'সরি, সিনর বেরেরা!' বলেই করিডর ধরে খানিকটা পিছিয়ে এলেন তিনি, শেলফের নির্দিষ্ট একটা খোপ থেকে টেনে নিলেন ইস্পাতের একটা বাক্স। তাঁর জানা আছে মেটাল বক্সের ভেতর ফাইলটা সুরক্ষিত ও তালা দেয়া, ভেঙে যাবার বা দুর্ঘটনাবশত স্থানচ্যুত হবার কোন আশঙ্কা নেই। 'নিন, মি. বেরেরা, নিন—আপনি রাখুন, প্লীজ!' বাক্সটা বেরেরার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ড. ডিউইট, আচরণে বন্ধুকে খুশি করার ব্যগ্রতা চাপা থাকল না।

বাক্সটা নিয়ে কোটের পকেটে ভরল বেরেরা। হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর বলল, 'আর তিন মিনিট বাকি আছে। জানালাটা কোথায় দেখিয়ে দিন কিয়াংশিকে।'

করিডরের অপরপ্রান্তে প্রথম সৈনিকের লাশ মেঝেতে শুইয়ে সিধে হচ্ছে কিয়াংশি, ড. ডিউইট তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, তারপর বেরেরাকে বললেন, 'জানালাটা আমাদের পিছনের একটা দেয়ালে, ডানদিকে...'

'পথ দেখান!' বেরেরার গলায় গম্ভীর নির্দেশ। পথ দেখাতে বললেও, ড. ডিউইটের জন্যে অপেক্ষা না করে পিছনের দেয়ালের খোঁজে নিজেই এগোল সে। তার নড়াচড়ার মধ্যে একটু আড়ষ্ট ভাব, একটা পা সামান্য টেনে টেনে হাঁটছে, তবে তার এই শারীরিক ত্রুটি এতটা গুরুতর নয় যে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হবে।

অনুগত ভৃত্যের মত বেরেরার পিছু নিল কিয়াংশি, ড. ডিউইটকে পাশ কাটাবার সময় তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে নিজের যে সর্বনাশ আপনি করলেন, ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। আমার বস্, সিনর বেরেরা, অবশ্যই আপনার এই আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করবেন।'

ড. ডিউইটের চোখে-মুখে একাধারে গর্ব ও দৃঢ়প্রত্যয়। 'আমি

grohon.com

কিছু পাওয়ার আশায় এই কাজে হাত দিইনি, মি. কিয়াংশি। প্রয়োজনে চরম আত্মত্যাগেও রাজি আছি, বিনিময়ে দেখে যেতে চাই জীবাণুযুদ্ধের আশঙ্কা থেকে আমাদের প্রিয় পৃথিবীটা মুক্তি পেয়েছে...'

জানালাবিহীন, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অফিস কামরায় অস্বস্তি ও অস্থিরতায় ভুগছেন কর্নেল বসওয়েল। ড. ডিউইটকে নিয়ে তাঁর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস নেই, কিন্তু অনুরোধে ঢেঁকি গিলে তাঁকে তিনি তিনজন লোক নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন, যাদের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নেই। শুধু কামবারল্যান্ড রিপজিটরিতে নয়, সরকারী বিভিন্ন রিসার্চ ল্যাবে গত বিশ বছর ধরে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি, কিন্তু ভুলেও কখনও একটা নিয়ম ভাঙেননি। আজ তাঁর কি যে হয়েছিল, ঈশ্বরই বলতে পারবেন! নিয়মটা ভাঙার পর এখন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। অস্থিরতা কমাবার জন্যে নীল টেলিফোন তুলে সার্জেন্ট হলের নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি। সার্জেন্ট জানাল, ড. ডিউইট তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রিপজিটরি থেকে এখনও বেরোননি। ঠকাস করে ক্রেডলে রিসিভার রেখে ঝড়ের বেগে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল, তিনটে করে ধাপ টপকে নামছেন নিচে।

কেন্টাকি এয়ারপোর্ট থেকে প্রতিদিন যাত্রীবাহী বোয়িংটা বিকেল সাড়ে তিনটের সময় টেকঅফ করে, কামবারল্যান্ড পর্বতশ্রেণীর মাথায় উঠে আসতে সময় নেয় দেড় মিনিট। কামবারল্যান্ড ক্যানিয়ন পাঁচ মাইল লম্বা, একজোড়া হেলিকপ্টার গানশিপ ক্যানিয়নের পুব প্রান্ত থেকে রওনা হয়েছিল তিনটে একত্রিশ মিনিটে। ক্যানিয়নের পুব প্রান্ত থেকে কামবারল্যান্ড রিপজিটরি বা রিসার্চ ল্যাবের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। গতি এবং সময়ের চুলচেরা

হিসাব অক্ষুণ্ণ রেখে জোড়া গানশিপের পাইলটরা রিপজিটরির সরাসরি সামনে খাদের তলায় যখন ল্যান্ড করল, বোয়িঙের কান ঝালাপালা করা গর্জন তখনও চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে। ক্যানিয়ন সাতশো ফুট গভীর, আসার পথে চারশো ফুটের বেশি ওপরে একবারও ওঠেনি তারা। ফলে রিসার্চ ল্যাব কমপাউন্ডের ওয়াচ টাওয়ার থেকে হেলিকপ্টার গানশিপ দুটোকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ওগুলোর আগমন বার্তাও চাপা পড়ে যায় বোয়িংঙের বিকট গর্জনে।

পরবর্তী কর্মসূচিও ঘড়ির কাঁটা ধরে সারল পাইলট ও গানাররা। অতিকায় একজোড়া যান্ত্রিক ফড়িং-এর মত খাদের তলা থেকে উঠে এল কালো রঙ করা হেলিকপ্টার গানশিপ, সমতল পাহাড় চূড়া থেকে একশো ফুট উঁচুতে স্থির হলো, প্রথম গানশিপের প্রথম টার্গেট নাক বরাবর সামনে ওয়াচ টাওয়ার ও তাতে বসানো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান। গানারের নির্ভুল নিশানায় পরপর দুটো কামানের গোলা বা শেল ওয়াচ টাওয়ারের মাথায় বিস্ফোরিত হলো। তারপরও ওখানে যদি কেউ বেঁচে গিয়ে থাকে, আগুন ধরে যাওয়ায় তার পক্ষে পালানো সম্ভব হবে না। পাইলট গানশিপের মুখ ঘোরায়নি, আগুনটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল প্রথম হেলিপ্যাডের মাথায়, সেখানে স্থির হয়ে গানারকে সুযোগ করে দিল নাক বরাবর সামনে দ্বিতীয় হেলিপ্যাডে কামান দাগার। দ্বিতীয় হেলিপ্যাডে 'ইউএস এয়ারফোর্স' লেখা হেলিকপ্টার গানশিপ থাকলেও, তাতে কোন পাইলট বা গানার নেই, ফলে মেশিন গানের বুলেট আর কামানের গোলায় সেটা বিস্ফোরিত হলেও, কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটল না।

তবে দ্বিতীয় গানশিপের একজন গানার রিপজিটরির মূল দালান ও জেনারেটর হাউজিং-এর ছাদে চারজনকে খুন করল মেশিন গানের গুলিতে। দুই ছাদের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও

grohon.com

ধ্বংস হয়ে গেল শেলের আঘাতে।

প্রথম হেলিপ্যাডে ছিল একটা যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার, স্থান বদল করে সেটাকেও টার্গেট করল প্রথম গানশিপ। হামলা শুরু হবার পর এক মিনিটের মধ্যে রিসার্চ ল্যাব কমপাউন্ডের সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, হামলাকারী গানশিপের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত একটা বুলেটও ছোঁড়া হয়নি। হামলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে টহলরত প্রহরী আর চেক পোস্টের গার্ডরা যে যেখানে পারে আড়াল নিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতায় শুধু আতঙ্কিত নয়, দিশেহারা হয়ে পড়েছে তারা; কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না আসায় তাদের বিভ্রান্তি আরও বেড়ে গেল। সবগুলো টার্গেট নিশ্চিহ্ন করে কালো গানশিপ দুটো কমপাউন্ডের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে, মাঝেমধ্যে দু'এক পশলা গুলি করছে চেক পোস্টে। সৈনিকরা এক জায়গায় জড়ো হতে না পারায় পরামর্শ করার সুযোগ পাচ্ছে না, যে যার বুদ্ধিমত বিচ্ছিন্ন ভাবে রিপজিটরি বিল্ডিঙের দিকে ছুটল। ড. ডিউইট তিনজন আগন্তুককে নিয়ে ওখানে ঢুকেছেন, কাজেই আসল সর্বনাশ ওখানেই ঘটছে, এটাই তারা ধরে নিয়েছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে যখনই কেউ ছুটল, অমনি গানশিপ থেকে গুলি করে ফেলে দেয়া হলো তাকে। এরকম দু'তিনটে লাশ পড়ার পর আড়াল থেকে সৈনিকদের বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল।

রিপজিটরি এরিয়ার ভেতর, এক সারি শেলফের পিছন দিকের দেয়ালে, গরাদবিহীন কাঁচের জানালা। জানালার একপাশে দাঁড়িয়ে ড. ডিউইট আর কিয়াংশি সমীহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বেরেরার দিকে। তাদের সঙ্গী ইয়াকোমোর হাতে হীরে বসানো একটা গ্লাস-কাটার দেখা যাচ্ছে, হাতলটা প্লাস্টিকের। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে জানালার কাঁচ কাটছে সে। কাটা কাঁচ ধরে নিচে নামাতে তাকে সাহায্য করল কিয়াংশি।

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কিয়াংশির হাতে ধরিয়ে দিল বেরেরা। মেঝেতে নামিয়ে রাখা চৌকো কাঁচের নিচে চিরকুটটা গুঁজে দিল কিয়াংশি।

বেরেরার দিকে ফিরে ড. ডিউইট শুরু করলেন, 'আমরা কি...'

তাঁর কথা শেষ হলো না, রিপজিটরির কমপাউন্ড থেকে মেশিনগান ও কামানের আওয়াজ ভেসে এল।

ঝাড়া এক মিনিট কেউ নড়ল না বা কথা বলল না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে বেরেরা বলল, 'আমাদের বাহন আরও তিন মিনিট পর আসবে। তবে ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।'

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন কর্নেল বসওয়েল। সার্জেন্ট হল ও করপোরাল ড্রেক আগের মতই পাথুরে অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে তাদের চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। রিপজিটরি দরজার ফাটলে মুখ রেখে ভেতরের গার্ডদের ডেকেও কর্নেল যখন সাড়া পেলেন না, সার্জেন্ট ও করপোরাল গম্ভীর দৃষ্টি বিনিময় করল।

অকস্মাৎ শীত অনুভব করলেন কর্নেল, পকেট থেকে এক সেট চাবি বের করে ইস্পাতের দ্বিতীয় দরজাটা খোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় হেলিকপ্টার গানশিপ খাদ থেকে উঠে আসার এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেলেন তিনি। 'এখানেই থাকো তোমরা!' বলে করিডর ধরে ছুটলেন, হলরুমে ঢোকার আগে এক ঝটকায় দেয়ালের একটা লাল সুইচ অন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমপাউন্ডের প্রতিটি দালানের ভেতর অ্যালার্ম বেজে উঠল, কিন্তু শব্দটা চাপা পড়ে গেল মুহুর্মুহু কামান আর মেশিনগানের গর্জনে।

হলরুমের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যটা দেখে কর্নেলের

grohon.com

grohon.com

সন্দেহ হলো তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন না তো! তাঁর চোখের সামনেই একে একে বিস্ফোরিত হলো ওয়াচ টাওয়ার, হেলিপ্যাড, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ও চেক পোস্টগুলো। সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার তিনি হল ও ড্রেকের কাছে ফিরে এলেন। দরজার তালা খোলার পর দেখা গেল ভারী কবাট সহজে নড়তে চাইছে না। কবাটের গায়ে আটকে আছে লাশ।

গায়ের জোরে কবাট খুলে ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। তাঁকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল হল ও ড্রেক। সঙ্গী সৈনিকদের লাশ তাদেরকে যতটুকু বিচলিত করল, তারচেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত করে তুলল শেলফের একটা খালি খোপ।

খালি খোপটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে তিনজনই। পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকাল ওরা–বিস্ময়, অবিশ্বাস, ক্রোধ ও ভয় সংক্রমিত হচ্ছে একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে।

এই সংক্রমণ এখন শুধু গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা।

শেলফের পিছনদিকে জানালা আছে, মনে পড়তে সেদিকে ছুটলেন কর্নেল। কাঁচ কাটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে প্রথমে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপর দূরের আকাশ তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল। তিনটে হেলিকপ্টার হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে।

আপাত শান্ত রোববার বিকেলের সেই ঘটনা মাসুদ রানারও নাগাল পেতে চাইছে, শুধু এখনও কিছু জানা নেই ওর। এইমুহূর্তে রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখায় ব্যস্ত সময় কাটছে ওর। শাখা প্রধান আবীর আর তার সহকারিণী মিলা অনেকদিন পর তাদের প্রিয় মাসুদ ভাইকে অফিসে পেয়ে পুরানো ও অমীমাংসিত পঁচিশটা কেসের ফাইল নিয়ে সেই যে সকালবেলা ওর চেম্বারে ঢুকেছে, তারপর আর বেরুবার সুযোগ পায়নি।

প্রতিটি কেস হিস্ট্রি খুঁটিয়ে পড়ল রানা, প্রশ্ন করে জেনে নিল

খুঁটিনাটি আরও অনেক তথ্য, তারপর হয় যৌক্তিক একটা সমাধান বাতলে দিল, নয়তো বলে দিল দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নতুন কি পদ্ধতিতে তদন্ত চালাতে হবে। দুপুর পর্যন্ত মাত্র দুটো ফাইল দেখা শেষ হলো। বাইরে থেকে লাঞ্চ এল, খাওয়ার সময়ও কাজ বন্ধ হলো না। সাড়ে চারটের দিকে দেখা গেল এখনও দশটা ফাইলে হাতই দেয়া হয়নি। দশ মিনিটের কফি বিরতির পর নতুন উদ্যমে আবার মুখ গুঁজতে যাবে রানা ফাইলে, পিপ পিপ করে একজোড়া শব্দের সঙ্গে লাল টেলিফোনের গায়ে ততধিক লাল একটা আলো জ্বলে উঠল।

বুকটা একেবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার।

আবীরও ছোটখাট ধাক্কা খায়নি, চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিলা সিধে হলো ধীরে ধীরে, নিজের অজান্তেই ঢোক গিলল একটা।

রানা এজেন্সির নিজস্ব পরিভাষায় লাল টেলিফোনের ওই লাল আলোটাকে 'সুপার গ্লু' বলা হয়। ওটা জ্বলার মানে হলো বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান স্বয়ং রানার নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দাবি করছেন, অর্থাৎ রানাকে তাঁর যে-কোন মুহূর্তে দরকার হতে পারে। তাই যত জরুরী কাজই থাকুক হাতে, ওই আলো যতক্ষণ জ্বলবে ততক্ষণ ওটার পাশে হাজির থাকতে হবে ওকে।

কিছু বলতে হলো না, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল আবীর, তার পিছু নিয়ে মিলাও। ইতিমধ্যে সবুজ একটা বোতাম টিপে বসকে রানা নিরব মেসেজ পাঠিয়েছে–ফোনের সামনেই আছে ও।

রানা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কিন্তু লাল টেলিফোনটা বাজছে না। যখন বাজল, আরেকবার চমকে উঠল ও। কারণ, লালের বদলে সাদা একটা টেলিফোন বাজছে।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রিসিভার তুলল রানা, শান্ত গলায়

grohon.com

বলল, 'ইয়েস। মাসুদ রানা স্পীকিং।'

'হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে আপনাকে বৈকালিক শুভেচ্ছা, মি. মাসুদ রানা,' ভরাট ও মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে রিসিভারে, ইংরেজি বাচন ভঙ্গিতে টেক্সাসের টান। 'মি. প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আমি তাঁর একান্ত সচিব ডানকান কাইল আপনার খানিকটা সময় প্রার্থনা করছি।'

চট করে লাল আলোটার দিকে একবার তাকাল রানা। ওটা জ্বলল, আর তারপরই হোয়াইট হাউস থেকে ফোন-গোটা ব্যাপারটা যেন একটা পরিকল্পনার অংশ। বস্ যেন ওকে বোঝাতে চাইছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে অপেক্ষা করছেন তিনি, যদিও সরাসরি রানার সঙ্গে বার্তা বিনিময়ে রাজি নন।

হাত বাড়িয়ে আরেকটা বোতাম টিপল রানা-ঢাকা হেডকোয়ার্টারে বসে রাহাত খান এখন হোয়াইট হাউসের সঙ্গে রানার সব কথাবার্তা শুনতে পাবেন। 'বলুন, মিস্টার কাইল, আমি শুনছি,' জবাব দিল রানা।

'বিশেষ জরুরী একটা কারণে সিআইএ চীফ জন স্যান্ডফোর্ড এই মুহূর্তে হোয়াইট হাউসে রয়েছেন,' মার্কিন প্রেসিডেন্টের একান্ত সচিব বললেন। 'উনি এইমাত্র বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছেন। মি. স্যান্ডফোর্ড ল্যাংলিতে আপনাকে কফি খেতে ডাকার তাগাদা অনুভব করছেন, এটাই ছিল ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আমার জানামতে এ-ব্যাপারে জেনারেল রাহাত খান উভয় পক্ষকে নিজের সম্মতির কথা জানিয়েছেন-অর্থাৎ আপনাকে এবং মি. স্যান্ডফোর্ডকে।'

লাল আলোটার পাশে সবুজ একটা আলো জ্বলতে দেখল রানা।

'হুঁ-হুঁ,' ইতিবাচক নরম আওয়াজ করল রানা।

শব্দ শুনে বোঝা গেল ডানকান কাইল স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ

করলেন। 'মি. রানা, এখন তাহলে সিআইএ চীফ মি. স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন।'

এক মুহূর্ত পরই রানা আরেকটা গলা শুনতে পেল, 'মাসুদ রানা?' গম্ভীর স্বর, জড়তাবিহীন স্পষ্ট উচ্চারণ। 'আমি স্যান্ডফোর্ড। আসুন না, একসঙ্গে বসে কফি খাই আমরা? শোফার আমার গাড়ি নিয়ে আপনার অফিসের দরজায় অপেক্ষা করছে। আপনি উঠে বসলেই আপনাকে নিয়ে আমাদের অফিসে চলে আসবে। আসছেন তো?'

রানা দেখল, লাল টেলিফোনে সবুজ আলোটা এখনও জ্বলছে। 'হ্যাঁ, আসছি। ধন্যবাদ, মি. স্যান্ডফোর্ড।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রিসিভার নামিয়ে রাখছে রানা, লাল টেলিফোনের দুটো আলোই একযোগে নিভে গেল।

দুই

সিআইএ হেডকোয়ার্টারে রানার আগেই পৌঁছেছেন জন স্যান্ডফোর্ড। একজন পথ দেখিয়ে তাঁর খাস চেম্বারে রানাকে পৌঁছে দিতে চেয়ার ছেড়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। যেন অদৃশ্য কোন ইঙ্গিত পেয়ে পিছনের একটা দরজা খুলে গেল, ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল নীলনয়না এক তরুণী। 'নির্ভেজাল কফি, মি. রানা?' স্যান্ডফোর্ড জিজ্ঞেস করলেন। 'বেলিন্ডা নিশ্চয়ই আমারটাতে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে এনেছে।'

'হ্যাঁ, শুধুই কফি।' ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে

grohon.com

হেলান দিল রানা, ডেস্কের ওদিকের প্রান্তে 'মাসুদ রানা' লেখা ফাইলটা বসার আগেই দেখতে পেয়েছে। অনেকগুলো ফাইল, সবচেয়ে ওপরে রয়েছে ওরটা।

'আমি কোন ভূমিকা করব না,' মেয়েটা কফি পরিবেশন করে বিদায় নিতেই সিআইএ চীফ শুরু করলেন। 'কারণ অপচয় করার মত সময় পাচ্ছি না আমরা। জানি আপনার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাকে, তবে সেটা পরে, ঠিক আছে? মি. রানা, আপনি কামবারল্যান্ড রিসার্চ অপারেশন সম্পর্কে তো জানেন, তাই না?'

'পরিষ্কার কিছু নয়, ভাসা ভাসা শুনেছি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনাদের ভাইরাস ফ্যাক্টরি।'

'কামবারল্যান্ড রিপজিটরিতে সব মিলিয়ে ষাট ধরনের ব্যাকটিরিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, মানুষের জানামতে ওগুলোর একটারও কোন অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক নেই। ওগুলোর যে-কোন একটা কোনভাবে যদি ছড়িয়ে পড়ে, গোটা একটা শহরের সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করে দেবে, কিংবা হয়তো আরও অনেক বড় এলাকা জুড়ে সর্বনাশ ঘটাবে। ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ভাইরাস X-99। গোটা পৃথিবী গ্রাস করবার ক্ষমতা রাখে ওটা। আজ বিকেলে, এখন থেকে দু'ঘণ্টা আগে কামবারল্যান্ড রিপজিটরি থেকে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

সেরেছে! আঁতকে উঠে মনে মনে আল্লাহকে ডাকল রানা। এক চুলও নড়েনি।

'ছিনতাই বা ডাকাতি বলাই উচিত,' আবার শুরু করলেন সিআইএ চীফ। 'কাজটা করেছেন কামবারল্যান্ড রিপজিটরির ডিরেক্টর ও প্রধান বিজ্ঞানী ড. ক্লিনটন ডিউইট। তাঁর সঙ্গে তিনজন লোক ছিল, যাদের আমরা চিনি না। হামলাটা করা হয় মিলিটারি অপারেশনের আদলে, সব মিলিয়ে কমপাউন্ডের মোট ষোলোজন সৈনিক মারা গেছে।'

'ড. ক্লিনটন ডিউইট। ইদানীং খুব বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছিলেন। পাগলাটে নাকি?'

'পাগল বললে খুব কমই বলা হয়,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'বিজ্ঞানী বা ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট হিসেবে নিঃসন্দেহে বিরাট এক প্রতিভা। চিরকালই তিনি সরকারের ভাইরাস নীতির কঠোর সমালোচক। তাঁর কথা হলো, যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ভাইরাসের ব্যবহার মানবজাতির অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনবে। আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, এতদিন আমাদের সঙ্গে ড. ডিউইট কাজ করেছেন এই ভেবে যে তিনি তাঁর পজিশন থেকে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবেন। তারপর যখন ভুলটা ভাঙল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।'

'কিন্তু তাঁর এই হিংস্রতা? আপনারা আগে থেকে কিছুই টের পাননি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একজন বিজ্ঞানী সামরিক কায়দায় অপারেশন চালাবেন, ষোলোজন সৈনিককে খুন করবেন, স্বাভাবিক বলে মানা যায় না। এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন শক্তি কাজ করছে। অন্তত কেউ তাঁকে সাহায্য তো অবশ্যই করছে। অপারেশনে যারা তাঁর সঙ্গী ছিল তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি?'

'হ্যাঁ, আপনার ধারণা ঠিক, বাইরের কোন শক্তি তাকে সাহায্য করছে। ওরা তিনজন আজ সকালে জেনারেল সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স নিয়ে কামবারল্যান্ডে পৌঁছায় ড. ডিউইটের বিশেষ অতিথি হিসেবে,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'তাদের মধ্যে দু'জন জাপানি, নাম ওতানা কিয়াংশি ও তাকানাতা ইয়াকোমা।

'ঘটনাটা ঘটার পর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ব্যাকটিরিয়োলজিস্টদের আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে এই নামে দু'জন বিজ্ঞানী জাপান থেকে ওয়াশিংটনে এলেও, আজ তাঁরা রাজধানীর বাইরে কোথাও যাননি। অর্থাৎ তাঁদের পরিচয় নিয়ে অন্য লোক ড. ডিউইটের অতিথি হয়েছিল। তৃতীয় লোকটার

grohon.com

কেসও তাই। সে এসেছিল হুইল চেয়ারে বসে, মেক্সিকান বিজ্ঞানী মিগুয়েল আকাকুঁতো বেরেরার ছদ্মবেশে। প্রসঙ্গত, বেরেরা অনেকটাই আলবার্ট আইনস্টাইনের মত দেখতে। আমার ধারণা, এই লোকটাই ড. ডিউইটকে পরিচালনা করছে।'

রানার বুকের ভেতর কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা তারে মৃদু টোকা পড়ল। 'হুইল চেয়ার কেন?'

'এ প্রশ্ন আমাদেরও,' বললেন স্যান্ডফোর্ড, হাভানা চুরুটের বাক্সটা খুলে বাছাই করছেন। 'রিপজিটরির গার্ডদের কাবু করার জন্যে গুণ্ডা দরকার হতে পারে–জাপানি দু'জন নিশ্চয় তাই। কিন্তু একজন পঙ্গু লোক কি করছিল ওখানে?'

একটু নড়েচড়ে বসল রানা। 'আমি অন্তত একজন আংশিক পঙ্গু বিজ্ঞানীকে চিনি, মানবজাতির কল্যাণের নামে এ-ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে উৎসাহের কোন অভাব নেই তার। সেই শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি বিপজ্জনক অপারেশনে নিজে উপস্থিত থাকা।'

'কার কথা বলছেন আপনি? পরিচয় কি তার?' চুরুটটা ধরাতে গিয়ে সিআইএ চীফের হাত স্থির হয়ে গেছে।

'আমার ধারণা, আপনাদের পুরানো কোন ফাইলে তাকে পাওয়া যাবে, মি. স্যান্ডফোর্ড,' বলল রানা। 'তবে তার প্রসঙ্গে পরে আলাপ করা যাবে। আগে আপনি ঘটনার বর্ণনা দিন, তারপর ব্যাখ্যা করুন এ-সব আমাকে কেন শোনাচ্ছেন।'

'রিপজিটরিতে একটা চিরকুট রেখে গেছে ওরা,' বলে রানার দিকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন স্যান্ডফোর্ড।

ভাঁজ খুলে চিরকুটের লেখা দ্রুত পড়ল রানা।

'কেউ আমাদের কথা শুনছে না, কাজেই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। এটাই আমাদের প্রথম ও শেষ আলটিমেটাম। দুনিয়ার যেখানে যত ব্যাকটিরিয়োলজিক্যাল ওঅরফেয়ার স্টকপাইল আছে, সব ধ্বংস করে ফেলতে হবে, তা না হলে মানবজাতির

শত্রুদের আমরা উচিত শাস্তি দেব। খুঁজে কোন লাভ নেই, আমরাই যোগাযোগ করব। আমাদের নির্দেশমত কাজ না হলে দুনিয়ার যেখানে সুযোগ পাব সেখানেই আমরা মানুষের ওপর আঘাত হানব। তবে এ-সব যে মিথ্যে হুমকি নয় তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ার জন্যে দু'এক ফোঁটা X-99 ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেলা হবে। রাজধানীসহ দু'পাঁচটা শহর প্রাণীশূন্য হয়ে গেলে আশা করা যায় পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউসের কানে পানি ঢুকবে। ড. ডিউইট ও ড. কে. সি।'

পড়া শেষ হতে মুখ তুলল রানা, ওর চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে স্যান্ডফোর্ডের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। 'এই কে.সি-টা কে হতে পারে, মি. রানা? আমাদের পুরানো ফাইলে যার নাম আছে বলছিলেন, এ কি সে-ই?'

'আপনাদের পুরানো ফাইলে যে আছে তার একটা নাম কবীর চৌধুরী,' বলল রানা। 'এটাই তার আসল নাম। তবে এই কে.সি সে-ই কিনা তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।'

'এই কবীর চৌধুরী কি সত্যি বিপজ্জনক, মি. রানা? মানে, দুনিয়াটাকে নিয়ে সে কি ছিনিমিনি খেলতে পারে?'

রানার সংক্ষিপ্ত জবাব, 'হ্যাঁ, এই খেলাটা তারচেয়ে ভাল আর কেউ পারে বলে মনে হয় না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন স্যান্ডফোর্ড। 'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের বিশটা ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্য চেয়ে আমি ঠিক কাজই করেছি।'

'হ্যাঁ, মি. স্যান্ডফোর্ড, এবার আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, আমি সিআই-এ হেডকোয়ার্টারে কি করছি।'

'আপনি তো জানেনই, আগামী হপ্তায় ইউনাইটেড নেশনস-এ ওয়ার্ল্ড লীডারশিপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'বলতে গেলে ইতিহাসে এটাই প্রথম বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক। সবাই মিলে দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা নিয়ে

grohon.com

আলোচনা করার এরকম আয়োজন আগে কখনও করা হয়নি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উদ্বোধনের দিন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের রথী-মহারথীরা কে কে উপস্থিত থাকবেন, এই তালিকাটায় চোখ বুলালেই বুঝতে পারবেন।'

স্যান্ডফোর্ডের বাড়ানো হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল রানা। নাম করা রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রায় সবাই আছেন তালিকায়। রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবেন পুতিন। কায়রো থেকে আসছেন হোসনী মোবারক। আসছেন চীন, ফ্রান্স, সিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টরা। পাকিস্তানের সামরিক শাসককেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড থেকে আসছেন প্রধানমন্ত্রীরা। জার্মানীর চ্যান্সেলারও আসবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রিটেনের রানী ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত থাকবেন জীবিত সব ক'জন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, পোপ, দালাই লামা, পৃথিবীর সবগুলো প্রধান উপজাতির একজন করে প্রতিনিধি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এত বড় সমাবেশ সত্যি আগে কখনও হয়নি। তালিকাটা ফিরিয়ে দিল রানা, প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বিশাল গোলটেবিল বৈঠকের ঠিক এই সময়টায় ড. ডিউইট X-99 নিয়ে পালালেন। আশা করি এর তাৎপর্য আপনাকে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা গ্লোবাল ইমার্জেন্সী, রাইট, মি. রানা?'

'রাইট,' একমত হলো রানা।

'সিআইএ ছাড়াও আমাদের আরও অনেক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আছে,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'কিন্তু এরকম একটা বিশ্বগ্রাসী সঙ্কট আমেরিকা একা সামলাতে পারবে না। তাছাড়া, বিপদটা যখন দুনিয়ার সবার, সামলাবার দায়িত্বও সবাইকে ভাগ করে নিতে

হবে। এ-ব্যাপারে আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তাঁদের পরামর্শ অনুসারেই আমি সিদ্ধান্ত নিই বাছাই করা কয়েকটি দেশের ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্য নেব।' তাঁর সামনে ফাইলের স্তূপটায় টোকা মারলেন। 'এখানে বিশটা দেশের বিশজন নাম করা এসপিওনাজ এজেন্টের ফাইল আছে। এদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে যার যার ইন্টেলিজেন্স থেকে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ওয়াশিংটনেই পাওয়া গেছে। তাঁদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছি আমি। বাকি সবাই কাল দুপুরের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন। আমি সংশ্লিষ্ট ইন্টেলিজেন্স চীফদের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর কেউই তাঁরা এজেন্ট পাঠিয়ে সাহায্য করতে আপত্তি জানাননি। মি. রানা, এখন যদি আপনি আনুষ্ঠানিক ভাবে শুনতে চান-বিভিন্ন দেশের এজেন্টদের নিয়ে আমি একটা টীম গঠন করব, সেই টীমে আপনিও থাকবেন। এ-ব্যাপারে আপনার বসের সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্ট কথা বলেছেন। জেনারেল রাহাত খান স্বীকার করেছেন, এটা একটা গ্লোবাল ইমার্জেন্সী এবং আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে তিনি আপনার নামই সাজেস্ট করেছেন।'

'যুক্তি ও ব্যাখ্যা মেনে নিলাম,' বলল রানা। 'দায়িত্ব নিতেও আপত্তি নেই। তবে একটা প্রশ্ন আছে। আমার মত বিদেশী এজেন্টদের সঙ্গে নাহয় আলাদাভাবে বসছেন বা বসবেন, কিন্তু সিআই-এর এজেন্টরা কোথায়? তারা কি করছে?'

ধরাবার পর এই প্রথম চুরুটটায় ভাল করে টান দিলেন স্যান্ডফোর্ড। 'তাদেরকেই তো সবার আগে ব্রিফ করা হয়েছে। এরইমধ্যে সাড়ে তিনশো এজেন্ট ছড়িয়ে পড়েছে ডিসিতে। এফবিআই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, ফেডারেল পুলিস, সিক্রেট সার্ভিস, নুমা-কেউ বসে নেই, মি. রানা।'

'গুড। এবার বলুন চিরকুটে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-সমস্ত

grohon.com

মারাত্মক ভাইরাস ধ্বংস করে ফেলতে হবে–সে-ব্যাপারে কি করা হয়েছে?'

'হোয়াইট হাউস বা পেন্টাগন এ-ধরনের হুমকির মুখে নতি স্বীকার করতে রাজি নয়, মি. রানা। তারা বলছে...'

স্যান্ডফোর্ডকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এখন এ-ধরনের জেদ বা অহমিকা মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, মি. স্যান্ডফোর্ড। ড. ডিউইট একা হলে কথা ছিল, কিন্তু আমি কে.সি-কে ভয় পাচ্ছি। সে যদি কবীর চৌধুরী হয়, মিথ্যে হুমকি দেয়নি সে। বলেছে যখন, দু'এক ফোঁটা ফেলবেই ওয়াশিংটনে।'

প্রথমে লাল, তারপর নীল হয়ে গেল সিআইএ চীফের মুখ, যেন এরইমধ্যে X-99 কাজ শুরু করেছে। 'আপনি তাহলে কি করতে বলেন?'

'ওদেরকে জানিয়ে দিন, নির্দেশ মত কাজ করছেন আপনারা। তাহলে হয়তো দয়া করে ওয়াশিংটনে বিষটা ফেলবে না ওরা।'

'আমি যদি ঠিকমত বোঝাতে পারি তাহলে হয়তো নতি স্বীকার করতে রাজি হবে হোয়াইট হাউস। কিন্তু আমরা যে নির্দেশটা মেনে ভাইরাস নষ্ট করতে যাচ্ছি, এ খবর ডিউইট আর কে. সি-কে জানাব কিভাবে? এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা টপ সিক্রেট সিকিউরিটি। জানাজানি হয়ে গেলে শুধু ওয়াশিংটন বা আমেরিকায় নয়, সারা দুনিয়ায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। এটা তো কোনমতেই ঘটতে দেয়া যাবে না।'

'কৌশল অবলম্বন করুন,' বুদ্ধি দিল রানা। 'কেউ হুমকি দিয়েছে এ-কথা উল্লেখ না করেই ঘোষণা করুন, সরকার নীতি বদলেছে, এখন থেকে নতুন কোন মারাত্মক ভাইরাস তৈরি করা হবে না, পুরানো ভাইরাসও ধ্বংস করে ফেলা হবে।'

'ধন্যবাদ, মি. রানা,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'আমারও মনে হচ্ছে এরকম একটা ঘোষণায় কাজ হতেও পারে। আর কোন পরামর্শ, প্লীজ?'

'কবীর চৌধুরীর সাইকোলজি সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু ড. ডিউইট সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এ-বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারব। ড. ডিউইট সম্পর্কে আমরা যা জানি তার সবই পেন্টাগনের চীফ সাইকিয়াট্রিস্ট ড. কার্ট অস্টিনকে বলা হয়েছে,' জবাব দিলেন স্যান্ডফোর্ড। 'তার উপসংহার হলো, ড. ডিউইটের প্রধান লক্ষ্য আমেরিকাকে জখম করা, সম্ভবত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কারও মারাত্মক ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে। ডিউইটের মা-বাবা ও বোন হিরোশিমায় নিহত হন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেথোডিস্ট মিশনারি হিসেবে ওখানেই তাঁরা ছিলেন। ড. অস্টিন বলছেন, ডিউইটের উদ্দেশ্য সৎ বা মহৎ হতে পারে, কিন্তু মা-বাবা ও একমাত্র বোন যাদের হাতে খুন হয়েছে তাদের প্রতি চাপা ক্রোধ আর ঘৃণাই তাঁর প্রধান চালিকাশক্তি।'

'ডাক্তারের ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে,' বলল রানা। 'সে যাই হোক, আপনার কিন্তু শুধু ওয়াশিংটনের কথা ভাবলে চলবে না, মি. স্যান্ডফোর্ড। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে সাবধান করতে হবে। কবীর চৌধুরীকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করি না। সে যে কখন কোথায় আঘাত হানবে, বলা মুশকিল। এবার বলুন, আপনার হাতে কি কোন সূত্রই নেই?'

'অন্তত একটা সূত্র আছে,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'সেটা হলো ডিউইটের বোন-ঝি ইভা। মামার ভাড়া করা বাড়িতেই থাকে মেয়েটা। আমরা এ-ও জানি যে ভাগ্নীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন ডিউইট। মেয়েটা পেশাদার টেনিস কোচ।'

'সে এখন কোথায়?'

'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানি ডিউইটের বাড়িতেই আছে। আমাদের দু'জন ফিল্ড এজেন্ট বাড়িটার ওপর নজর রাখছে।'

'ডিউইট আমেরিকায় থাকলে নিশ্চয়ই ভাগ্নীর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ভাবছি ওখান থেকেই আমি তদন্ত শুরু করব।'

grohon.com

'ভেরি গুড। আমি স্বস্তি বোধ করছি।' এই প্রথম হাসলেন সিআইএ চীফ। 'তবে, কাল দুপুরের মধ্যে বিদেশী এজেন্টরা সবাই পৌঁছে যাবেন, ঠিক দুটোয় আমি সবাইকে নিয়ে মীটিঙে বসতে চাই। তদন্তের কাজে যেখানেই আপনি থাকুন, মীটিঙে কিন্তু আসতেই হবে। আমি এরই মধ্যে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে আপনি থাকবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ডিউইটের ঠিকানাটা বলুন।'

'লিখে নিন, প্লীজ। বাড়িটা ওয়াশিংটনেই।'

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে রানা বলল, 'সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ইভা ওয়াশিংটন ছেড়ে পালাচ্ছে, তাহলে শহরের সব লোককে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অল্প সময়ের ভেতর তা সম্ভব হবে না। বিকল্প ব্যবস্থা হলো ইভাকে ওয়াশিংটনেই আটকে রাখা।'

'আপনি বলতে চাইছেন তাহলে আর ডিউইট ওয়াশিংটনে ভাইরাসটা ব্যবহার করবেন না?'

'ভাগ্নীকে যদি সত্যি ভালবাসেন।'

'তা বাসেন। ভাল কথা, ডিউইটের বাড়িতে আপনি যদি কাল সকালে যান, যাবার আগে আমাকে একটা রিঙ করলে ভাল হয়। ইতিমধ্যে কিছু ঘটলে জানতে পারব। আমার দুই ফিল্ড এজেন্ট ওয়াকি-টকিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।'

তিন

ওয়াশিংটনে রানা হিলটন ইন্টারন্যাশনালে উঠেছে। সন্ধে হয়ে

যাওয়ায় সেদিন আর এজেন্সির অফিসে ফিরল না ও, তবে আবীরকে ফোন করে শাখার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আরও কঠোর ও নিশ্ছিদ্র করার জরুরী নির্দেশ দিল। ড. ডিউইটের উৎসাহদাতা যদি কবীর চৌধুরী হয়, সিআইএ চীফ জন স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে ওর বৈঠকের খবর ঠিকই সংগ্রহ করবে সে; এবং পিছনে লাগার পরিণাম ভাল হবে না, এই মেসেজ দেয়ার জন্যে সে যদি রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখায় হামলা করে বসে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পরদিন সকালে তদন্তে বেরুল রানা। তৈরি হয়েই বেরুল। তবে তার আগে নিজের স্যুইট থেকে সিআইএ চীফকে টেলিফোন করতে ভুলল না।

স্যান্ডফোর্ড জানালেন, ব্যাকটিরিয়োলজিস্টদের সিম্পোজিয়ামে পাঠ করার জন্যে ড. ডিউইট যে পেপারটা তৈরি করেছিলেন, তার একমাত্র লিখিত কপিটা সিআইএ সিম্পোজিয়াম চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। তাতে উদ্ভট এমন সব কথা বলা হয়েছে, যার অর্থ উদ্ধার করা মুশকিল, তবে হুমকির সুরটা স্পষ্ট। সিআইএ ওটা চেয়ে নেয়ায় সিম্পোজিয়ামের চেয়ারম্যান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, কারণ ড. ডিউইটের পক্ষ থেকে তাঁরই ওটা পাঠ করার কথা ছিল।

আগেই বলা ছিল, হোটেলের গ্যারেজে অফিসের একটা গাড়ি রেখে গেছে আবীর। পুরানো মডেলের ছোট একটা অস্টিন, তবে এঞ্জিনটা নতুন ও শক্তিশালী।

গাড়ি নিয়ে শহরতলিতে চলে এল রানা। লম্বা ও নির্জন একটা রাস্তার শেষ মাথায় বাড়িটা। রোডের দু'পাশের বাড়ি-ঘরই শুধু নয়, গোটা এলাকা পরিত্যক্ত ও বসবাসের অযোগ্য বলে মনে হলো রানার। ড. ডিউইটের বাড়ির চারপাশে প্রচুর গাছ আর ঝোপ, সহজে বোঝাই যায় না যে ভেতরে একটা বাড়ি আছে। বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়, এক দেড়শো বছর আগে তৈরি করার

পর আর কোনও যত্ন নেয়া হয়নি। মনে মনে অবাকই হলো রানা। কামবারল্যান্ড অপারেশন-এর ডিরেক্টর হিসেবে বেতন তো আর কম পাওয়ার কথা নয় ডিউইটের। চিন্তাই করা যায় না এরকম বাজে একটা জায়গায় থাকতে পারেন উনি।

গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে ফাটল ধরা দরজার সামনে চলে এল রানা। বেল বাজাবার পর ওর সামনে উদয় হলো দ্বিতীয় বিস্ময়। বড় বড় চায়না-ব্লু চোখ, যৌবন আর লাবণ্যে টইটম্বুর মুখ, ছোট খাড়া নাক, ঠোঁট জোড়া সরু কমলা-কোয়া। ব্লু জার্সি ব্লাউজ পরেছে, ভরাট ও উন্নত স্তন যুগলের ওপর আঁটসাঁট। মিনিস্কার্টটা গাঢ় নীল, সুগঠিত পায়ের কিছুই ঢাকা পড়েনি। ইভা কেইনকে আর কিছু না হোক, মনোহারিণী বলতেই হবে।

'ড. ডিউইট, প্লীজ,' বলল রানা। চায়না-ব্লু চোখে কোন পরিবর্তন ঘটল না। তবে রানার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে চোয়ালে টান টান ভাব ঠিকই ধরা পড়ল। দরজার নব ধরা হাতের গিঁটগুলোও সাদা হয়ে আছে।

'তিনি তো এখানে নেই,' জবাব দিল মেয়েটি।

মিষ্টি করে হাসল রানা, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে দেখালই শুধু, পড়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দিল না। 'তাহলে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল ও। 'রানা, মাসুদ রানা।'

'ড. ডিউইট ফিরবেন না।' মেয়েটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'কিভাবে জানলেন?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। 'তিনি কি যোগাযোগ করেছিলেন?'

'না, না-তিনি ফিরবেন না এটা আমার ধারণা আর কি।'

কুমারী চায়না-ব্লু মিথ্যে কথা বলছে। আর নয়তো জানে কি ঘটেছে, ভাবছে মামা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে, এবং চায় না তখন আশপাশে কেউ থাকুক। ঘরে সস্তা ও পুরানো ফার্নিচার, সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে পাশের কামরায় উঁকি দিল রানা।

বেডরুম। বিছানার ওপর খোলা একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ। 'কোথাও যাচ্ছেন, ইভা কেইন?'

চায়না-ব্লু চোখ বিস্ফারিত হলো। 'যেখান থেকেই এসে থাকুন, দয়া করে এখুনি এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। এভাবে ভেতরে ঢুকে আমাকে জেরা করার কোন অধিকার আপনার নেই। আমি পুলিস ডাকব।'

'আপনার মামারও কোন অধিকার নেই সরকারের সম্পত্তি লুঠ করার,' বলল রানা।

'কি! মানে?' চেঁচিয়ে উঠল ইভা। তার বিস্ময় নির্ভেজাল মনে হলো রানার। তবে তা প্রকাশ করার সময় ওর দিকে তাকায়নি সে। কে জানে, হয়তো দক্ষ অভিনেত্রী। রানার দিকে ফিরল সে। চোখে একাধারে জেদ, উদ্বেগ আর সংশয় মাখামাখি অবস্থা। 'তিনি অন্যায় কিছু করেননি,' গলায় যথেষ্ট জোর। 'আমার মামা আন্তরিক, নিবেদিত-প্রাণ মানুষ। যা-ই তিনি করে থাকুন, তার পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে—দুনিয়াকে বোঝানো। ওই বোঝানোর দায়িত্বটা কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে।'

'একে আপনি মহৎ উদ্দেশ্য বলেন?'

বড় করে শ্বাস নিল ইভা। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করছে। তবে গাঢ় নীল ব্লাউজ যেভাবে উন্নত স্তনের ওপর আরও টান টান হলো, রানার পক্ষে শান্ত থাকা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

রানার দিকে রাগ রাগ ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে ইভা। 'একবার তো বললাম, কি ঘটেছে না ঘটেছে আমি জানি না। গরজ থাকলে আপনি আমাকে শোনাতে পারেন।'

হঠাৎ করেই রানার অনুভূতি হলো, মেয়েটা হয়তো অন্তত আংশিক হলেও সত্যি কথা বলছে, ডিউইট হয়তো বিশ্বাস করে সব কথা ভাগ্নীকে জানাননি। তবে সন্দেহ নেই মেয়েটা কিছু একটা ঘটার বা কারও আসার অপেক্ষায় আছে। নিজের সন্দেহের

grohon.com

কথা গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিল ও, তাতে মেয়েটার উদ্বেগ তুঙ্গেই থাকবে। ফলে ভুল করে কিছু একটা ফাঁস করে দিতে পারে। শুধু একটু হাসল, তাতে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে পায়চারি শুরু করল ইভা। একটা চেয়ার টেনে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, জানালার দিকে মেয়েটার চোরা চোখে ঘনঘন তাকানো যেন খেয়ালই করছে না। তারমানে কারও আসার অপেক্ষায় আছে, অপেক্ষাটা ফোনের জন্যে নয়। কে জানে, স্বয়ং ডিউইটেরই হয়তো আসার কথা। হাসি পেল রানার। দুনিয়া কাঁপানো একটা সঙ্কট শুরু হতে না হতে কেটে গেলে খুবই স্বস্তিকর হবে সেটা, কিন্তু তারপরও গোটা ব্যাপারটার মধ্যে হাস্যরসাত্মক নাটকের একটা উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে, সংক্ষেপে যেটাকে প্রহসন বলে।

'আপনি যে সত্যি একজন টেনিস কোচ, সেটা আপনার পায়চারি করা দেখেই বোঝা যাচ্ছে,' বলল রানা। 'কিন্তু মুশকিল হলো পিট সামপ্রাস হবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই, তাই বলছি একটু থামলে আলাপ করতে সুবিধে হত।'

'আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই।' ইভা থামল না বা তাকাল না।

রানার মনে হলো, ভাল-মন্দ কোন চাল যদি চালতেও চায়, ওর উপস্থিতি বাধা দিচ্ছে ইভাকে। ও বিদায় হলে সে হয়তো ডিউইটের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সেক্ষেত্রে পিছু নিতে পারবে ও।

চলে যাওয়াটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সামান্য অভিনয়ের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল, থেমে নোটবুক বের করল পকেট থেকে, বলপয়েন্ট দিয়ে দ্রুত লিখল, তারপর পাতাটা ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল ইভার দিকে। 'শহর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। ড. ডিউইট কোথায় আছেন জানতে পারলে এই নম্বরে কল করবেন।' কাগজটা নিল সে, কিন্তু

দেখল না। 'পরে আবার আসব আমি।'

চায়না-ব্লু চোখে কোন ভাব ফুটল না। তবে গাড়ির দিকে হাঁটার সময় রানা অনুভব করল জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

গাড়ি নিয়ে ফেরার সময় কথাটা আরেকবার ভাবল রানা, এরকম বিচ্ছিরি একটা জায়গায় কি কারণে থাকেন ডিউইট।

পাড়াটার শেষ মাথায় পৌঁছে গাছপালার আড়ালে গাড়ি থামাল রানা, ঘুর পথ ধরে পায়ে হেঁটে ফিরে এল বাড়ির পিছনদিকে। এখানে সিআইএর দু'জন ফিল্ড অফিসারের থাকার কথা, স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে তাদের ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ আছে। এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সহজতম মাধ্যম হতে পারে তারা।

জঙ্গলমত জায়গাটার কিনারায় পৌঁছে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা। পেটে গুলি খাওয়া ওর ইচ্ছে নয়। ফিল্ড অফিসাররা ট্রিগার টানার আগে হয়তো সতর্ক করবে, তবে বলাও যায় না। তাছাড়া, ইভার চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকিও ও নিতে চায় না।

ক্রল করে কয়েকটা ঝোপকে পাশ কাটাল রানা। বাড়িটার সরাসরি পিছনে এসে ফিসফিস করল, 'আমারই আসার কথা—মাসুদ রানা।' এরপর উত্তরের আশায় কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা। কারও সাড়া নেই। আরেকটু সামনে এগিয়ে গলা আরও খাদে নামিয়ে আবার নিজের উপস্থিতি জাহির করল। এবার সামনের ঝোপের পিছন থেকে উঁচু হলো একটা হাত। আঙুল নেড়ে ডাকছে ওকে। সেদিকে এগোল রানা। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হলো কাঠামোটা। তরুণ একজন এজেন্ট, একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। এক হাতে .৩৮। ল্যুগারটা হোলস্টারে ভরে রাখল রানা।

'মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল সিআই-এর ফিল্ড অফিসার। 'কোড বলুন, প্লীজ।'

কোড বলে তার পাশে স্থির হলো রানা। তরুণের পেশীতে

grohon.com

grohon.com

ঢিল পড়ল, মাথা ঝাঁকিয়ে আরেক দিকে ইঙ্গিত করল। সেদিকে তাকাতে দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পেল রানা, আরেক ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে আছে, হাতে একটা কারবাইন। এতক্ষণ রানাকে কাভার দিচ্ছিল সে, এখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

'মি. স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই,' প্রথম এজেন্টকে বলল রানা। 'ওয়াকি-টকিটা একবার দেবে?'

ওয়াকি-টকি হাতে আসতে দ্রুত পাশ ফিরে ডান কনুইয়ের ওপর শরীরের ভার চাপাল রানা। একেই বলে নেহাত বরাতজোরে বেঁচে যাওয়া, জানতে পারলে রাঙার মা মীরপুরের মাজারে সদকা দিতে ছুটবে। প্রথম গুলিটা ওয়াকি-টকির এরিয়ালে লাগল, ঠিক যেখানে ওর মাথা ছিল। বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা ধাতব পদার্থ ও প্লাস্টিক। ঝট করে মুখ ঘোরালেও ধাতবের কিছু খুদে টুকরো আঘাত করল, কপাল ও নাকের একটা পাশ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। পরমুহূর্তে বাড়ির পিছনের পুরো জঙ্গলটাই অটোমেটিক উইপন আর রাইফেলের মিলিত গুলিবর্ষণে মুখরিত হয়ে উঠলো।

এরিয়ালবিহীন ওয়াকি-টকি কোমরে আটকে রাখল রানা।

কারবাইন হাতে দ্বিতীয় এজেন্ট সিধে হলো, কেঁপে উঠল, লাশ হয়ে শোয়ার পর দেখা গেল খুলির প্রায় অর্ধেকটাই নেই। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল রানা, ডালপালা সরিয়ে উল্টোদিকে তাকাতে কয়েকজন লোককে দেখতে পেল, গাছপালার ভেতর দিয়ে এদিকেই আসছে, সবার হাতে অস্ত্র। মর শালারা! রানার এটা ঠিক রাগ নয়, ঝাল। ঝাল দেখিয়েও কোন লাভ নেই, কারণ এটা ওদের স্বাভাবিক বুদ্ধির ফল। ওরা জানত বাড়িটার ওপর নজর রাখা হবে, আর নজর রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা হলো বাড়ির পিছনদিকের জঙ্গল। কাজেই প্রহরীদের প্রহরা দিচ্ছিল ওরা, শিকার বানিয়েছে

শিকারীদের।

তরুণ সিআইএ এজেন্ট পাল্টা গুলি করছে, তার সামনে গাছপালার আড়াল নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে খুনীরা। এক বা দু'জনকে টার্গেট করলে, বাকিরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গুলি করছে তাকে। বারবার গড়ান দিয়ে জায়গা বদলে ট্রিগার টানছে সে। টেকনিকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু তাকে সাবধান করার কোন সুযোগ নেই রানার। অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের ঝাঁক ঝাঁক বুলেটে ওর মাথার সামনের মাটি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। হাতে ল্যুগার নিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে আছে রানা, ওর অবস্থান প্রতিপক্ষকে জানতে দিতে রাজি নয়। ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পেল, বারবার গড়ান দিয়ে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছতে চাইছে সিআইএ এজেন্ট। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় ভয় পেয়েছে সে।

'এভাবে পালানো সম্ভব নয়,' বেসুরো গলায় বিড়বিড় করল রানা। শুনতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না, তরুণ এজেন্ট ওর কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে। ছোকরা অটোমেটিক অস্ত্রের আরও দু'পশলা বর্ষণ এড়িয়ে গেল, গড়ান দিয়ে পৌঁছাল ফাঁকা জায়গায়, এক লাফে সিধে হয়েই ছুটল প্রাণপণে। পাঁচ পা-ও এগোতে পারেনি, ঝাঁঝরা পিঠ নিয়ে আছাড় খেলো, তারপর আর নড়লই না।

মাটি কামড়ে পড়ে থাকল রানা। বাড়িটার দিকে তাকাল। গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখা গেল কালো একটা মার্সিডিজ রাস্তার ওপারের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সিআইএ এজেন্টদের খুন করার সময় আনা হয়েছে ওটা। গাড়ির লোকজন মেয়েটাকে বের করার জন্যে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে, আরেক দল বাড়ির পিছনের পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করছে। পিছনের একটা জানালায় ঠিক ইভাকে নয়, তার নীল ব্লাউজটা এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা।

grohon.com

আবার জঙ্গলের দিকে চোখ ফেরাল ও। গাঢ় ছায়ামূর্তির মত খুনীদের একটা লাইন, ছড়িয়ে পড়ার পর অত্যন্ত সাবধানে, ধীরস্থিরভাবে খুঁজছে ওকে। বোঝা গেল, গুলি শুরু করার আগেই ওকে তারা দেখেছে, জানে সব মিলিয়ে লোক ছিল তিনজন। ইতিমধ্যে মাত্র দু'জনের হিসাব পেয়েছে তারা। আরেকজন এখানেই কোথাও আছে, লম্বা একটা রেখা তৈরি করে তাকে ফাঁদে আটকানোটাই উদ্দেশ্য। রানা এখন যত দ্রুতই গুলি করুক, বড়জোর দলটার অর্ধেক লোককে খুন করতে পারবে, ততক্ষণে বাকি লোকগুলো রেঞ্জের ভেতর কায়দা মত পেয়ে যাবে ওকে। আর ছুটে পালানোর চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই, কি পরিণতি হবে সে তো দেখাই আছে।

বাড়িটার দূরত্ব আন্দাজ করল রানা। সমস্যা হলো ফাঁকা জায়গায় বেরুনো মাত্র সহজ টার্গেট হয়ে যাবে। তবে পিছনদিকের জানালাগুলো খুব বেশি দূরে নয়। ফুল স্পীডে দৌড়ালে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড লাগতে পারে। এ এমন এক পরিস্থিতি, শুধু বুদ্ধি ও সাহসে কুলাবে না, বস্তু বা পদার্থের সাহায্যও লাগবে। খালি হাতটা জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল রানা।

অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে খুনীদের লাইনটা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। রানার হাতে একটা অতি সাধারণ ছোট বাক্স বেরিয়ে এসেছে, ধাতব ঢাকনির ওপর লেখা 'অ্যাসপিরিন'। বাক্স খুলে দুটো ক্যাপসুল বের করল, কেউ খেলে নিশ্চয়ই মারা যাবে, তবে রানার এখনকার মাথা ব্যথায় খুব কাজ দেবে। দুটো ক্যাপসুলের ঠিক মাঝখানে নখ দিয়ে চাপ দিল ত্রিশ সেকেন্ড, অনুভব করল নরম মধ্যভাগ চাপ খেয়ে ডেবে যাচ্ছে। ওর ভেতরের ট্রিগার মেকানিজম সচল হলো, সেই সঙ্গে শুরু হলো রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আরও পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করে ক্যাপসুল দুটো ছুঁড়ে দিল শূন্যে–ডানে ও বাঁয়ে।

মাটিতে লম্বা হলো আবার, এক দুই করে সেকেন্ড গুনছে।

ঠিক দশ সেকেন্ড পর একযোগে বিস্ফোরিত হলো ক্যাপসুল দুটো। কালচে-নীল ধোঁয়া, অসম্ভব তার ঝাঁঝ, মাটি থেকে দ্রুতগতি মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল, রানার ডান ও বাম দিকে একজোড়া পাঁচিল তৈরি করছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়, ঘন ধোঁয়ার আড়াল পাওয়ায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। যতই ঝাঁঝাল হোক, তাজা বাতাস পাবার পর কারও কোন অসুবিধে হবে না, শুধু আরও কিছুক্ষণ চোখের পানি ফেলতে হতে পারে। সামনে একটা জানালা, মনে হলো শূন্যে ঝুলছে। ওটাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। একরাশ ভাঙা কাঁচ সহ মেঝেতে পড়ল শরীরটা, একটা মাত্র গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হলো। হাতের পিস্তল ছাড়েনি, কিন্তু যখন দেখল গুলি করলে ইভা মারা যাবে, ঢিল দিল ট্রিগারে।

ছোটখাট এক জাপানি নিজের সামনে ধরে রেখেছে ইভাকে। পিছু হটছে ওরা, লিভিংরূমে ঢুকবে। চোখ না ঘুরিয়েও বুঝতে পারল রানা, এটা একটা বেডরূম। ইভাকে দু'হাতে ধরে আছে লোকটা, হোলস্টারে অস্ত্র থাকলেও বের করতে পারছে না।

ইভাকে জিম্মি মনে করার কোন কারণ নেই, স্বেচ্ছায় পিছু হটছে সে। তবে চোখ জোড়া প্রায় বিস্ফারিত হয়ে আছে, সম্ভবত প্রবল উত্তেজনায়। হয়তো এই লোকগুলোর অপেক্ষাতেই ছিল সে। তাকে নিখোঁজ হতে সাহায্য করছে ওরা।

ওদেরকে অনুসরণ করে লিভিংরূমে পা রাখল রানা। চৌকাঠ পেরুচ্ছে, ডান ও বাম দু'দিক থেকে হামলা হলো। প্রথমে চোখের কোণে ধরা পড়ল ডান দিকে কিছু নড়ল। শরীরটাকে মুচড়ে সরে যাবে, বাম দিক থেকে একটা পিস্তলের বাঁট নেমে এল কপাল বরাবর। সরাসরি লাগলে হাড় গুঁড়ো হয়ে যেত, পিছলে যাওয়ায় চোখে সর্ষে ফুল দেখল রানা। মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই লোকটার পায়ে ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে লাথি লাগাল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল লোকটা, কিন্তু ডানদিকের লোকটা

grohon.com

ঝাঁপ দিল ওর ওপর। সিধে হতে যাচ্ছিল রানা, হাতের পিস্তল ছাড়েনি, উপায় না দেখে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল একটা। প্রথম লোকটা পতন সামলে নিয়ে পিস্তল তাক করতে যাচ্ছিল, রানার দ্বিতীয় গুলি খেয়ে ওর পিস্তল ধরা হাতের কব্জি গুঁড়ো হয়ে গেল।

উঠবে বলে ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে রানা, আঘাতটা অবশ করে দিল ওকে। এত বড় আর ভারী পা জীবনে কখনও দেখিনি ও। দেখল মাত্র পলকের জন্যে, ঘাড়ে এসে পড়ছে। ভাগ্য ভাল যে হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে ছিল ও, ঘাড়টাও ঘোরাতে শুরু করেছিল, তা না হলে ওই পায়ের লাথি খেলে ঘাড়ের পেশী অবশ্যই ছিঁড়ে যেত। লাথিটা শূন্যে তুলল ওকে। উড়ে এসে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে থাকা লাশটার ওপর। পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে মেঝেতে ঘষা খেয়ে টেবিলের তলায় হারিয়ে গেল। চোখে ঝাঁপসা দৃষ্টি, ঘর জোড়া প্রকাণ্ড কাঠামোটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। রানার পিলে একেবারে চমকে উঠল। সুমো কুস্তিগির যে-ক'জনকে দেখেছে ও, এর তুলনায় তারা নেহাতই শিশু। সন্দেহ নেই, এই রক্ত-মাংসের পাহাড়টাই কামবারল্যান্ডে ডিউইট আর কে.সি-র পেশী হিসেবে গিয়েছিল। দুইপায়ে ভর দিয়ে আস্ত একটা বাড়ি যেন ওর দিকে সরে আসছে। পা রানারও আছে, কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করল কাঁপছে ওগুলো। ঢেউ সাগরেই ওঠে, মানুষের শরীরে মাংসের ঢেউ উঠতে দেখা রানার জন্যে নতুন অভিজ্ঞতা। স্নেহ তথা চর্বির এরকম আন্দোলনের মধ্যে ভীতিকর কি যেন একটা আছে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও।

পেশী শক্ত করার চেষ্টা আংশিক সফল হলো। মাথার ভেতরটা এখনও ঝনঝন করছে। ঘাড়টা অবশ হয়ে গিয়েছিল, ব্যথা শুরু হতে মনে হলো ওখানে আগুন ধরে গেছে। বাম হাতের মুঠো শক্ত করে ঘুসি মারল রানা। টলমল করছিল পা, লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে লাগল—পাহাড়টার বুকে। সংঘর্ষের কোন অনুভূতিই

হলো না, কোমল মাংসের ভেতরে হাতের বোধহয় অর্ধেকটাই ডেবে গেল। দুই মস্ত হাত পাকড়াও করল ওকে। শরীর টান টান করে আঙুল দিয়ে লোকটার মুখ খুঁজছে ও। অনুভব করল, মাংসের পুরু ভাঁজে হারিয়ে যাচ্ছে ও। জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেল। দম আটকে যখন মারা যাবার অবস্থা, বুঝতে পারল পাহাড়টার মাথায় তোলা হচ্ছে ওকে। তারপর দেয়াল লক্ষ্য করে ছুঁড়ল।

দেয়ালে এত জোরে পড়ল রানা, চিড় ধরে গেল প্লাস্টারে। মেঝেতে পড়ে হাঁপাচ্ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে চৈতন্য ধরে রাখার, সেই সঙ্গে আরেকটা লাথি খাবার ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই লাথিটা ঠিকমত লাগলে ঘাড় থেকে মাথাটা বোধহয় বিচ্ছিন্নই হয়ে যাবে। অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকল, ডাকছে মেয়েটা।

'আমি রেডি!' শুনে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল সুমো কুস্তিগিরদের ওস্তাদ। থপ থপ, তার পায়ের শব্দ সরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে কমে আসছে ঘরের কাঁপুনি। চোখ মিটমিট করে তাকাতে টেবিলের তলায় পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে হাত বাড়াল সেটার দিকে।

দেয়াল ধরে সিধে হলো রানা। টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল। বাড়ির সামনের দরজায় আসতে দেখতে পেল কালো মার্সিডিজে উঠছে ইভা। গাড়ির আরেক দিকে থাকায় দোরগোড়ায় দাঁড়ানো রানাকে দেখতে পেল কিয়াংশি। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করছে রানা, মাথা নিচু করে গাড়ির আড়ালে লুকাল সে। ল্যুগারের কয়েকটা বুলেট মার্সিডিজের ছাদের কিনারা খানিকটা উড়িয়ে দিল। রানাকে লক্ষ্য করে কেউ একটা গুলি ছুঁড়ল, ডাইভ দিয়ে উঠানে পড়ল ও, গড়ান দিয়ে সিধে হবার পর দেখল গর্জে উঠে ছুটছে মার্সিডিজ।

নিজের গাড়ি অনেকটা দূরে রেখে এসেছে রানা, তবু হাল না ছেড়ে ছুটল ও। হঠাৎ মনে পড়ল জঙ্গলের ভেতর খুনীরা আছে।

থেমে সেদিকে তাকাতে দেখল ধোঁয়ার রেশ এখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। ভেতর থেকে তিনজন মাত্র বেরিয়ে এসেছে, তবে মার্সিডিজকে চলে যেতে দেখে আবার জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে তারা। পিছু নেয়ার সময় নেই রানার। তাছাড়া যাকে আটকানো দরকার সেই ইভাই তো রয়েছে মার্সিডিজে।

গাড়িটা কোনদিকে গেছে দেখে রেখেছে, অস্টিন নিয়ে দশ মিনিট ছোটার পর আবার সেটাকে দৃষ্টিপথে পেয়ে গেল রানা। এক হাতে হুইল, অপর হাত দিয়ে ওয়াকি-টকির সুইচ অন করল ও। সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ডের গলা চিনতে পেরে বলল, 'মাসুদ রানা। ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই। কালো একটা মার্সিডিজকে ধরার অ্যালার্ম দিন, এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর সার্ভিস রোড ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছে। রাস্তার নাম নরবার্ট রোড।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সেট অফ করে দিল ও।

মার্সিডিজের গতি ষাট মাইলে উঠে গেছে। অস্টিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও বাড়ছে। গাড়িটায় ইভা আর কিয়াংশি ছাড়াও অন্য দু'জন লোককে দেখেছে রানা, তাদের মধ্যে একজন জাপানি। সম্ভবত ইভার পিছনে আড়াল নেয়া এই খাটো জাপানিটাও ডিউইটের সঙ্গে কামবারল্যান্ডে ছিল।

মার্সিডিজ এমনিতেই ভারী, তার ওপর আরোহীর সংখ্যাও বেশি, ড্রাইভারকে নিয়ে পাঁচজন। অস্টিনে রানা মাত্র একা, গাড়িটাও বিশাল কিছু নয়। রানা সুবিধে পাচ্ছে বাঁক ঘোরার সময়। কিন্তু প্রতিটি বাঁকে স্পীড কমাতে বাধ্য হচ্ছে মার্সিডিজের ড্রাইভার।

কিন্তু একটা বাঁক ঘোরার পর মার্সিডিজটাকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। সামনে আরও একটা বাঁক দেখে স্পীড না কমিয়ে সেটাও পেরিয়ে এল। আশ্চর্য, কোথাও নেই মার্সিডিজ! কয়েকশো গজ এগিয়ে ব্রেক কষল রানা, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসছে।

ফাঁকটা ওর ডানদিকে, সরু ও লম্বা একটা প্রবেশপথ, দু'ধারে

কাঠের পাঁচিল; পাশ কাটাবার সময় এমনকি দেখেওনি। একমাত্র সম্ভাবনা এই পথেই হারিয়ে গেছে মার্সিডিজ। অস্টিন নিয়ে ঢোকার পর রানা অনুভব করল মেঠোপথ ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। ঝাঁকি খেতে খেতে তলায় পৌঁছাল গাড়ি। দরজা খুলে লাফিয়ে নিচে নামল রানা, একহাতে ওয়াকি-টকি। বিশাল এক কনস্ট্রাকশন এরিয়ার মাঝখানে ও, চারপাশে কালভার্ট পাইপ, ইস্পাতের বীম, প্রকাণ্ড জেনারেটর—এখনও কাঠের স্কিড থেকে নামানো হয়নি—ইস্পাতের ফ্রেমওঅর্ক, ক্রেন, বুলডোজার, বালির পাহাড় ইত্যাদি। এ-সবের মাঝখানে সরু সরু অসংখ্য পথ। কিন্তু কোন মার্সিডিজ নেই। অবশ্য দু'পাঁচটা গাড়ি লুকিয়ে রাখার মত আড়াল যথেষ্টই আছে।

সিআইএ চীফের সাথে কথা বলা দরকার। সেটটা অন করার সুযোগই হলো না, একযোগে তিন দিক থেকে গুলি হলো। অস্টিনের দরজা ফুটো হয়ে গেল, একটা বুলেট হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওয়াকি-টকিটা। ক্রল করে গাড়ির তলায় ঢুকছে রানা, একটা বুলেট ট্রাউজার ফুটো করে দিল—ভাগ্যই বলতে হবে পায়ে লাগেনি।

গাড়ির তলা থেকে ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাচ্ছে রানা, এদিকেই আসছে। শরীর আর জমিনের মাঝখানে আটকা পড়েছে হোলস্টার। বাম হাত ভেতরে ঢুকিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, কিন্তু পিস্তলটা বের করতে পারছে না। যখন বের করতে পারল, একজোড়া পা গাড়ির ভেতর ঢুকছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এঞ্জিন। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে গড়ান দিল রানা, উপুড় হলো গাড়ি যখন পিছু হটছে, ট্রান্সমিশন আলতোভাবে ছুঁয়ে দিল কপালটা। পর মুহূর্তে ওর ওপর থেকে সরে গেল অস্টিন। সিধে হয়ে রানা দেখল ওর গাড়ি ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। অসহায় ও হতভম্ব, ওখানেই বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল। এই ঘটনার তাৎপর্য মারাত্মক। সিআইএ চীফের নির্দেশ পেয়ে পুলিস কালো একটা

grohon.com

grohon.com

মার্সিডিজ খুঁজছে। কিন্তু ইভা আর কুস্তিগির পালাচ্ছে অস্টিন নিয়ে। রোড ব্লকে ওদেরকে থামানো হবে না।

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই কয়েকটা জেনারেটরের আড়ালে পাওয়া গেল ওদের ফেলে যাওয়া গাড়িটাকে। নিশ্চয়ই চুরি করা, তাই ফেলে যেতে দ্বিধা করেনি।

কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে উঠে এসে নরবার্ট রোডে পৌঁছাল রানা, একটু পরই সঙ্গী হলো একটা পুলিস হেলিকপ্টার। পাইলটের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। লাউড হেইলার থেকে থামতে বলা হলো ওকে। থামার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আট-দশটা পুলিস কার ঘিরে ফেলল মার্সিডিজকে। নিচে নেমে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল ও। পুলিস অফিসাররা ওকে তাদের রেডিও ব্যবহার করতে দিল। স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে কথা বলল ও।

ডিউইটের বাড়ির দিকে ফেরার সময় মেয়েটার কথা ভাবছে রানা, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিল সে জানে না মামা তাকে কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। জানবে হয়তো অনেক দেরিতে। কিংবা আগেই জানবে, জেনেও না জানার ভান করে নির্লিপ্ত থাকবে।

বাড়িটার সামনে থেমে আড়ষ্টভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নামল রানা। সারা শরীরে টনটনে ব্যথা। এই ব্যথা ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে মারাত্মক একটা ভাইরাস উদ্ধার করতে হবে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে ইভার বেডরূমে চলে এল রানা। ট্র্যাভেলিং ব্যাগে কাপড় ভরার সময় এত ব্যস্ত ছিল মেয়েটা, দু'একটা মেঝেতে পড়ে গেলেও তোলার কথা ভাবেনি। সার্চ শেষ করে কামরা থেকে বেরিয়ে আসবে ও, চোখের কোণে রূপালি কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল। মেঝে থেকে জিনিসটা তুলে পরীক্ষা করল। ছোট লকেট-এর মত দেখতে, রূপোর একটা রিঙকে ঘিরে ঢিলেঢালা কয়েকটা লিঙ্ক ঝুলছে। রূপোর ওপর কিছু একটা

বসানো আছে–হাড় বা আইভরি হতে পারে। সম্ভবত ইভার জিনিসপত্র ব্যাগে ভরার সময় ব্যস্ততার কারণে কারও কাছ থেকে ছিঁড়ে পড়ে গেছে লকেটটা। ওটা পকেটে ভরে গোটা বাড়ি সার্চ করল রানা।

ডিউইটের বেডরূমে তালা দেখে বোঝা গেল, শুধু ছুটির দিনগুলোয় এখানে এসে ভাগ্নীর সঙ্গে কাটাতেন তিনি। তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল রানা, সার্চ করে কিছুই পেল না। পাশেই ছোট্ট একটা স্টাডিরূম। এখানে একটা শেলফে বই নেই; আছে চেক বই, ক্যাশমেমো, রাইটিং প্যাড ইত্যাদি। ব্যবহার করা চেক বইগুলোর অবশিষ্ট অংশ পরীক্ষা করছে, অন্তত একটা রহস্যের সমাধান বেরিয়ে এল। রানা এখন জানে ড. ক্লিনটন ডিউইট কি কারণে এরকম বাজে এলাকার সস্তা একটা বাড়িতে ভাগ্নীকে নিয়ে থাকেন।

প্রতিমাসের প্রথম হপ্তায় জাপানের হোক্কাইদো শহরের একটা ব্যাংকে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠান ডিউইট। এই কাজ তিনি গত সাত-আট বছর ধরে করছেন, তারমানে সব মিলিয়ে কয়েক লাখ ডলার জাপানে পাঠিয়েছেন তিনি। ওই টাকা ভাল একটা ফান্ড। ধরে নিতে হয় প্রস্তুতির কাজে ব্যয় হবার কথা। কিসের প্রস্তুতি? নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোন ঘটনার জন্যে প্রস্তুতি। এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। গোপন কোন সংগঠনকে সাহায্য করছেন ডিউইট।

কয়েকটা বাছাই করা চেক বই দু'হাতে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে রানা, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর চারপাশে গোটা বাড়ি বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ, যেন একটা আগ্নেয়গিরি অকস্মাৎ উথলে উঠল। ঝাঁকিটা তুলে নিল রানাকে, বাইরের প্যাসেজে এনে ফেলল। পিছনের দুটো ঘর ধুলোর মত উড়ে গেল। দু'দিকের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে শরীরটা, বিকট শব্দের সঙ্গে ওর সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গোটা সিঁড়ি, চিলেকোঠার পাকা মেঝে আর টালির

grohon.com

ছাদ।

প্যাসেজে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, হড়কে এসে ওই গর্তে পড়াতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছে রানা। গর্ত থেকে উঠে এসে ফিরতি পথ ধরল ও। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে লকলকে জিভ বের করে বেরিয়ে আসা আগুনের আঁচ অনুভব করল গায়ে। ভেঙে পড়া ঘর দুটো পার হয়ে বাড়ির বাইরে বেরুতে প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল। ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে না। শুধু দূরে বাজছে ফায়ার ব্রিগেডের সাইরেন।

হোটেলে ফিরে গরম পানি ভরা বাথটাবে আধঘণ্টা শুয়ে থাকল রানা। ডাইনিংরুমে গেল না, রুম সার্ভিসকে দিয়ে স্যুইটে লাঞ্চ আনিয়ে খেলো। টেলিফোনে আগেই কথা হয়েছে, সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ড এসপিওনাজ এজেন্টদের মীটিং শুরু হবার এক ঘণ্টা আগে ওকে পৌঁছাতে অনুরোধ করেছেন।

মার্সিডিজটা পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে রানা। সিআইএ হেডকোয়ার্টারে ট্যাক্সি নিয়ে আসতে হলো।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ হতেই স্যান্ডফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'চেক বই দেখে কিছু জানা গেল?'

'আমাদের এজেন্ট খোঁজ নিয়ে বলছে, তিন দিন আগে অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওটা ব্যবহার করছিল মি. কিয়াংশি নামে এক লোক–সাবেক সুমো কুস্তিগির। কুস্তি থেকে অবসর নেয়ার পর সে নাকি আরও মোটা হয়ে পড়েছে।'

'হিসাব মিলছে,' বলল রানা। তারপরই জানতে চাইল, 'আমার গাড়ি?'

'এখনও ওটা পাওয়া যায়নি।'

'ডিউইটের কোন খবর? কে.সি-র আসল পরিচয়?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন স্যান্ডফোর্ড। 'কবীর চৌধুরীর পুরানো ফাইল

পড়তে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে। এ তো রূপকথাকেও হার মানায়! বিজ্ঞানী হিসেবে বিরল একটা প্রতিভা, মৌলিক আবিষ্কারের সংখ্যাও বহু, সমাজ থেকে বৈষম্য আর শোষণ দূর করার জন্যে সোচ্চার, মানব সভ্যতার কল্যাণে আত্মনিবেদিত; অথচ তিনিই টাকার প্রয়োজনে ব্যাংক ডাকাতি করেন, মানুষকে জিম্মি করেন, নাজেহাল করেন বিভিন্ন সরকার ও সংগঠনকে। স্ট্রেঞ্জ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা যেন সহানুভূতিই জানাল। 'আমাকে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারেন, মি. স্যান্ডফোর্ড?'

'ডিউইট আর কে.সি যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঘটনার প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পালিয়েছে, কেননা রাত দশটার দিকে ওয়াশিংটন সহ আমেরিকার সব বড় শহরের এয়ারপোর্ট, সী-পোর্ট, হাইওয়ে আর রেল স্টেশনে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর তা না হলে ওয়াশিংটনে বা আশপাশের কোন রাজ্যে লুকিয়ে আছে ওরা।'

'তারমানে ইভা আর সুমো কুস্তিগির কোনভাবেই পালাতে পারবে না?'

'প্রায় অসম্ভবই বলব।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রানা। বেলিন্ডা আজও কফি পরিবেশন করল। 'এজেন্টদের মীটিঙে কাদেরকে পাচ্ছি আমরা?' স্যান্ডফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল ও।

'আমরা মোট চারজন,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'সিআইএ, এফবিআই, সিক্রেট এজেন্সি ও নুমার একজন করে এজেন্ট। লন্ডন থেকে আসছে পিটার বন্ড, ভারত পাঠাচ্ছে ময়ূখ গাঙ্গুলীকে। মোসাড প্রতিনিধির নাম হাদান কারভি।'

'রাশিয়া থেকে?'

'ভ্লাদিমির বুনিন। চাইনিজ ইন্টেলিজেন্স পাঠাচ্ছে ঝাং

ঝিয়াংকে। ইটালি, জার্মান ও কানাডা থেকে আসছেন মাইকেল রাফটার, মার্ক টোন ও মার্লিন বার্জার।'

'পাকিস্তান থেকে কেউ আসছে না?'

'ফয়সল খান আসছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করবেন জিকু নডবেল, কোরিয়ার লী ফাং, মালয়েশিয়ার জয়নাল সারফাজ, মিশরের হোসেন শাহবাজ, ইরানের হামিদ খোরা। সব মিলিয়ে বিশজন হতে পারে। এরা প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে ওয়াশিংটনে আগে থেকেই আছেন, যে যার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট তদারক করতে এসেছেন। তদারকির দায়িত্ব এখন অন্যেরা পালন করবে।' স্যান্ডফোর্ড হাতঘড়ি দেখলেন। 'আর দশ মিনিট পর মীটিং, মি. রানা। চলুন, আমরা কনফারেন্স হলে গিয়ে বসি।'

'এক মিনিট,' বলে ডিউইটর বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা স্যান্ডফোর্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এটার কথাই ফোনে বলছিলাম। জিনিসটা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, এজেন্টরা কেউ হয়তো কিছু জানতেও পারে।'

জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখে রানাকে ফিরিয়ে দিলেন স্যান্ডফোর্ড। 'আমার তো মনে হচ্ছে স্রেফ এক টুকরো হাড়। দেখা যাক, ওঁরা কেউ আলোকপাত করতে পারেন কিনা।'

চার

বিশটা দেশের তেইশজন ওরা। এসপিওনাজ জগতের একেকটা রত্ন। বুদ্ধি, মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সাহস–বিভিন্ন সময়ে ও

সঙ্কটে এই পাঁচটি গুণের পরীক্ষায় সেরা নির্বাচিত হতে হয়েছে, কয়েক হাজার সতীর্থ এসপিওনাজ এজেন্টকে পিছনে ফেলে উঠে আসতে হয়েছে প্রথম সারিতে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ একেকজন। প্রত্যেকে সারভাইভার। যে-কোন মূল্যে দেশের স্বার্থ রক্ষা করাই ওদের ধর্ম। দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, দেশও ওদেরকে নিয়ে গর্বিত।

পরস্পরকে প্রায় সবাই ওরা চেনে। পরিচয় যদি না-ও হয়ে থাকে, ফাইল ও ফটো তো অবশ্যই দেখা আছে। শুধু লী ফাং আর ঝাং ঝিয়াং ছাড়া বাকি সবাই ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। একটু খাটো বলে কিনা কে জানে, দক্ষিণ কোরিয়া আর চীন পাশাপাশি বসল। সবার শেষে পৌঁছাল তানাকা তাকাওশি, জাপানি ইন্টেলিজেন্স, পরিচয়-পর্ব ও কুশল বিনিময়ের পর কিভাবে যেন ফাং আর ঝিয়াং-এর মাঝখানে জায়গা করে নিল–সে-ও সাড়ে পাঁচ ফুট বলে কিনা কে জানে।

লম্বা টেবিল, এক মাথায় তিন এজেন্টকে নিয়ে স্যান্ডফোর্ড বসেছেন; টেবিলের আরেক মাথায় একটা চেয়ার। আপাতত সেটা খালি। সিআই-এর অন্যান্য কর্মকর্তা, হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগনের প্রতিনিধিরা বসেছে পাশের অন্য একটা টেবিলে।

রানা বসেছে ভারতের ময়ূখ গাঙ্গুলী আর জার্মানির মার্ক টোন-এর মাঝখানে। ওর মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে সাবেক কেজিবির ভ্লাদিমির বেনিন আর মোসাড-এর হাদান কারভিকে।

প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে রানার। বন্ধু বললে বন্ধু, শত্রু বললে শত্রু। কুশল বিনিময়ের সময় অতিরিক্ত কোন বাক্য বা ভাব বিনিময় হলো না। যে যার ইন্টেলিজেন্স থেকে সঙ্কট সম্পর্কে আগেই প্রাথমিক ধারণা পেয়েছে, কাজেই সবাই গম্ভীর ও সতর্ক–ব্যক্তিগত অনুভূতি যেন একসঙ্গে কাজ করতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

'জেন্টলমেন,' আনুষ্ঠানিকভাবে মীটিঙের কাজ শুরু করলেন

grohon.com

সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ড, 'আপনারা সবাই আসতে পারায় আমি খুশি, ব্যক্তিগতভাবে সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। খুব অল্প কথায় পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করব। এরকম ভান করে কোন লাভ নেই যে এখানে সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। বর্তমান সঙ্কট সবার জন্যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, কাজেই বলা চলে যে সবাই আমরা নিজেদের গরজে এখানে মিলিত হয়েছি।'

'তবে এ-কথাও উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে কামবারল্যান্ডে আপনাদের সিকিউরিটিতে সিরিয়াস গলদ থাকার কারণেই এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে,' ভ্লাদিমির বেনিনের ভারী গলা কনফারেন্স হলের ভেতর গমগম করে উঠল।

'আমি নিশ্চিত, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমে এরচেয়েও বেশি গলদ দেখতে পেলে খুশি হন আপনারা,' হাসিমুখে, শান্ত গলায় বললেন স্যান্ডফোর্ড, চোখের পাতা একচুল নড়ল না।

বেনিনের নীল চোখে আরও যেন ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটল। সে-ও নিষ্পলক।

'আমাদের ব্যাকটিরিয়োলজিকাল ওঅরফেয়ার স্টক পাইল-এর ওই ফাইলে X-99 আছে,' আবার শুরু করলেন স্যান্ডফোর্ড। 'বটুলিজমের একটা সিরিজ থেকে গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হয় ওই ভয়ঙ্কর ভাইরাস। বাতাসে ছড়ায়, যে-কোন আবহাওয়ায় বংশ বিস্তার করতে পারে, সংশ্লিষ্ট হবার জন্যে প্রয়োজন শুধু একটা হোস্ট অর্গানিজম। কাজেই আপনাদের যার যার রাষ্ট্রের ঘরে ধারে শুধু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এই ভাইরাসকে কোনভাবেই ঠেকাতে পারবে না।

'আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে ড. ক্লিনটন ডিউইট ও কে.সি কোথায় আছে জানা, তারপর যে-কোন মূল্যে ভাইরাসটা উদ্ধার করা। আপনারা যে যার পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত শুরু করবেন, প্রাপ্ত তথ্য পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করবেন। সময় হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ভাইরাস X-99 উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সবাই একটা টীম হিসেবে কাজ করব, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল তা ভুলে গিয়ে। আরেকটা কথা। টীম থাকলে টীম লীডারও থাকা দরকার। আমার ব্রিফিং শেষ হলে আমি চাইব আপনারা গোপনে ভোট দিয়ে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে লীডার নির্বাচিত করবেন। সবাইকে প্রার্থী হিসেবে ধরে নেয়া হবে, নিজের ভোটটা নিজেকেও আপনি দিতে পারবেন।'

ব্যালট পেপার বলতে প্রত্যেকের জন্যে এক টুকরো সাদা কাগজ। আর কে কি করল রানা বলতে পারবে না, ও নিজেকেই পছন্দ করল।

হোয়াইট হাউস থেকে পাঠানো একটা চিঠি রিসিভ করলেন সিআইএ চীফ।

কাগজগুলোর ভাঁজ খোলার পর কার নামে ক'টা ভোট পড়েছে গোনা হলো। ইটালি, জার্মান, মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিরা একটা করে ভোট পেয়েছে, অর্থাৎ ওদেরকে সম্ভবত অন্য কেউ ভোট দেয়নি। রাশিয়ার বেনিন পেয়েছে সাত ভোট, শুনে হাসি আর ধরে না তার। এখনও অনেক ব্যালটের ভাঁজ খোলা বাকি, কাজেই তার ভোট সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গণনা শেষ হবার আগেই সবার সঙ্গে করমর্দন করছে সে, বিনয়ে বিগলিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। পরবর্তী দুটো ব্যালটে পাওয়া গেল মোসাডের এজেন্ট হাদান কারভির নাম। পরপর তিনটে ব্যালটে পাওয়া গেল রানার নাম। বেনিনের ভোট বেড়ে হলো আট। রানার নিজের ভোটটা যোগ হলো–চার। পরপর আরও চারটে ব্যালটেও ওর নাম। হলো আট।

বেনিন আর রানার ভোট সংখ্যা সমান।

বেনিন উত্তেজিত, জানতে চাইল, 'রানা আর আমি যদি সমান সংখ্যক ভোট পাই তাহলে কি হবে?'

স্যান্ডফোর্ড বললেন, 'টস।'

মাথা নাড়ল বেনিন। 'আমি ফ্রেশ ইলেকশন দাবি করব।'

রানা কৌতুক করে বলল, 'তবু ভাল যে বলোনি ডুয়েল লড়তে চাও!'

'ফ্রেশ ইলেকশনে তুমি ভয় পাও?' রানার দিকে সরাসরি তাকাল বেনিন।

'তার প্রয়োজন হবে না,' বলল রানা। 'শেষ পর্যন্ত দু'জনের ভোট সমান হলে তোমার নেতৃত্ব মেনে নেব আমি, তুমি যেহেতু আমার চেয়ে সিনিয়র।'

'কারও দয়া বা দান আমি গ্রহণ করি না,' বলল বেনিন। 'আত্মসম্মানে বাধে। তাছাড়া, এখানে কেউ আমরা ছোট বড় নই, আমাদের সবার স্ট্যাটাস সমান। টাই হলে আবার সবাইকে ভোট দিতে হবে। আমিই জিতব, জিতে টীম লীডার হব।'

'আর মাত্র দুটো ব্যালট বাকি,' বললেন স্যান্ডফোর্ড, হাতের ব্যালটের ভাঁজ খুললেন। 'মাসুদ রানা।'

'আমি জানি শেষ ভোটটা আমার,' বলল বেনিন। 'আমার ভোট আমি কাকে দিয়েছি জানি, কাজেই ফলাফলও আমার জানা।'

শেষ ব্যালটটা খুলে চোখ কপালে তুললেন স্যান্ডফোর্ড। 'সব ব্যালটেই নাম লেখা হয়েছে ইংরেজিতে, কিন্তু শেষ ব্যালটে দেখতে পাচ্ছি ভাষাটা রুশ। লেখা রয়েছে: মাসুদ রানা।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, রানা!' সবার আগে বেনিনই অভিনন্দন জানাল রানাকে। ওর হাতটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে বলল, 'উপকার করে ঋণী করতে চেয়েছিলে আমাকে, কিন্তু ঘটল উল্টোটা। তুমিই আমার কাছে ঋণী হয়ে থাকলে।'

রানা টীম লীডার নির্বাচিত হওয়ায় সবাই খুব খুশি, তবে সবার চেয়ে বেশি খুশি দেখাচ্ছে বেনিনকে। সে যেন তার উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না। নিজেকে রানা সাবধান করে রাখল, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে–ও লীডার হওয়ায় বেনিনের কোন

লাভ আছে কিনা।

শ্যাম্পেনের বোতল খুলে নব নির্বাচিত লীডারের স্বাস্থ্য পান করা হলো।

স্যান্ডফোর্ড সময় অপচয় করার মানুষ নন, সামনের ফাইল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললেন, 'মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই চিঠিটা হোয়াইট হাউসে পৌঁছেছে। পোস্টমার্ক দেখে বোঝা যায়, পাঠানো হয়েছে আইওয়া রাজ্যের ছোট একটা শহর থেকে। আমি পড়ছি।'

চিঠিটা হুবহু এরকম:

> 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা আশা করি এরই মধ্যে আপনি প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে একযোগে আপনাদের ব্যাকটিরিয়োলজিকাল ওঅরফেয়ারের স্টক ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি ফাইনাল করে ফেলেছেন। তা যদি করে না থাকেন, আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। মিনিট ও সেকেন্ড গুনতে থাকুন। খুব শিগ্‌গিরই আমরা X-99 ছড়াতে যাচ্ছি, এবং তার ভয়াবহ পরিণতির জন্যে এককভাবে দায়ী থাকবেন আপনিই। আমরা অ্যাকশন দেখতে চাই, মি. প্রেসিডেন্ট। পাবলিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে কান পেতে আছি। ক্লিনটন ডিউইট ও কে.সি।'

চিঠিটা হাত বদল হতে হতে আবার স্যান্ডফোর্ডের কাছে ফিরে এল।

'ওদের নির্দেশ মেনে নেয়া হয়েছে, আপাতত এরকম ভান করতে কোন অসুবিধে আছে কি?' জানতে চাইল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পিটার বন্ড।

'ওরা বোকা নয়, বন্ড,' বলল বেনিন। 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।'

'মি. বেনিনের সঙ্গে আমি একমত,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'এই যে লুকিয়ে আছে, এটাও ওদের প্ল্যানের একটা অংশ। আমি বলতে চাইছি, ওদের গোপন আস্তানা সময় থাকতে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যদি দেখে আমরা নির্দেশ মত কাজ করছি না, X-99 ঠিকই বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। কিভাবে দেবে, তাও সম্ভবত প্ল্যান করা আছে।'

'আপনারা মারাত্মক ভাইরাস ধ্বংস করতে রাজি নন, তাই না, মি. স্যান্ডফোর্ড?' ফ্রান্সের প্রতিনিধি জানতে চাইল। 'প্রশ্নটা আমি শুধু আমেরিকাকে নয়, একই সঙ্গে জার্মানী, ইটালি, ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়াকেও করছি। জীবাণুযুদ্ধ তো ভাল কথা নয়, তাই না?'

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে সবাই, কারও মুখে কথা নেই।

টীম লীডার হবার পর এই প্রথম মুখ খুলল রানা। 'সব দেশ যদি তাদের ভাইরাসের মজুদ নষ্ট করে ফেলে, তাতেই বা কি? তারপরও যে ডিউইট আর কে.সি X-99 ফেরত দেবে, সে নিশ্চয়তা কোথায়?' মাথা নাড়ল ও। 'অযথা সময় নষ্ট না করে আসুন সবাই X-99 কিভাবে উদ্ধার করা যাবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাই।' হাতের মুঠো থেকে রূপোর গোল জিনিসটা টেবিলের ওপর রাখল ঠকাস করে। 'ডিউইটের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। কেউ কি বলতে পারেন, জিনিসটা কি?'

ইটালিয়ান, জার্মান, ইন্ডিয়ান ও ইসরায়েলি প্রতিনিধিরা জিনিসটা পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল। তানাকা তাকাওশি, জাপানি ইন্টেলিজেন্স, টেবিল থেকে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রুশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ভ্লাদিমির বেনিন, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ সকৌতুক হাসি।

'এটা একটা আইডেনটিফিকেশন পীস,' তাকাওশি বলল। 'ছোটখাট একটা সিক্রেট সোসাইটি ব্যবহার করে। ওদেরকে সেমি-রিলিজিয়াস বলা যেতে পারে।' মাথা চুলকাল। 'আমার

জানামতে ওরা নরবলিতে অভ্যস্ত।'

কনফারেন্স হলে পিন-পতন নৈঃশব্দ নেমে এল।

'মাঝখানের এই সাদাটে জিনিসটা,' আবার বলল তানাকা তাকাওশি, 'মানুষের হাড়। আমেরিকা হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলায় যারা মারা গিয়েছিল, তাদেরই কারও। সন্দেহ নেই, পরীক্ষা করলে হাড়টায় এখনও খানিকটা রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে। শুনেছি এই সিক্রেট সোসাইটির শাখা যুক্তরাষ্ট্রেও আছে।'

'তাহলে বোধহয় ওদের কোন শাখাতেই লুকিয়ে আছে ডিউইট আর কে.সি,' বললেন স্যান্ডফোর্ড।

তাকাওশি হঠাৎ একটু চমকে উঠে বলল, 'আচ্ছা, আপনারা কেউ "বিশ্বপাগল সমিতি"-র নাম শুনেছেন?'

অনেকেই নড়ল না, কেউ কেউ মাথা নাড়ল।

'কিংবা "বিশ্বভ্রাতা সমিতি"-র?'

না, কেউ শোনেনি।

'বছর তিনেক আগে গোপন সূত্রে একটা খবর পাই আমরা, এই দুই সমিতির সভাপতি কবীর চৌধুরী নামে এক বিজ্ঞানী ও সমাজ সংস্কারককে ওই সিক্রেট সোসাইটি "অশুভ চক্রান্তের শিকার"-এর উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। চিঠিতে ডিউইটের সঙ্গে যার নাম রয়েছে, ওই কে.সি কি তাহলে সেই কবীর চৌধুরীই?' তাকাওশি কথা শেষ করল রানার দিকে তাকিয়ে। সিলভার পীসটা টেবিলে রেখে দিল সে।

হাত বাড়িয়ে সেটা তুলল বেনিন। লিঙ্কগুলোর প্রান্ত ধরে চোখের সামনে বার কয়েক দোলাল রূপোর রিঙ সহ হাড়টা। 'মেজর তাকাওশি মোটামুটি সঠিক তথ্যই দিলেন এই সিক্রেট গ্রুপ সম্পর্কে,' নরম, হালকা সুরে বলল সে। 'অনেক বছর আগে, কেজিবির আমলে, আমরা একবার ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওদের ক্ষমতা আর ওজন পরিমাপ করাই ছিল

উদ্দেশ্য, বুঝতে চেয়েছিলাম ভবিষ্যতে প্রয়োজন দেখা দিলে ওদেরকে কেজিবি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে কিনা।'

রানা লক্ষ করল, তাকাওশির পেশীতে একটু টান পড়ল, তবে বাইরের চেহারায় শান্ত ভাব ধরে রাখল সে।

ভারী গলা যতটা সম্ভব নরম করে বলে যাচ্ছে বেনিন, 'সে সময় সংখ্যায় খুব কম আর বিশৃঙ্খল ছিল ওরা, তাই কাজে লাগাবার আইডিয়াটা বাতিল করা হয়। তবে কিছু দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি, ওদের সংগঠন আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে, নতুন শক্তিও অর্জন করেছে। এরকম একটা খবরও পেয়েছি যে "বিশ্বপাগল সমিতি"-র সভাপতিকে উপদেষ্টা নিয়োগ করার পর "অশুভ চক্রান্তের শিকার" আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। স্বভাবতই ধরে নিতে হয় নতুন উপদেষ্টা কবীর চৌধুরীর পরামর্শেই।'

রানা ভাবছে, 'অশুভ চক্রান্তের শিকার' নতুন শক্তি পেয়ে থাকলে তার উৎস কবীর চৌধুরী না হয়ে যায় না। সংগঠনটার হাল ধরার পিছনে নিশ্চয়ই খুব বড় কোন মতলব বা প্ল্যান আছে তার। ভাইরাস X-99 চুরি করে অকারণে মানুষ মারবে, এই হুমকি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি ওর। ডিউইটকে সঙ্গে নিয়ে যে কাজই সে করুক, সেটা পাইকারি হারে মানুষ খুন করার মত তাৎপর্যহীন কিছু হবে না, কাজটায় মানুষের ইতিহাস বদলে দেয়ার মত উপাদান অবশ্যই থাকবে। বড় চিন্তা, বড় করে নিজেকে দেখা কবীর চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য। 'আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে মানে?' বুনিনকে প্রশ্ন করল ও। 'তাদের এখনকার ঠিকানা তোমার জানা নেই?'

'কেন, ঠিকানা পেলে কি করবে তুমি?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল বেনিন। 'কবীর চৌধুরীকে শায়েস্তা করার জন্যে ছুটবে? তার বিরুদ্ধে তোমাদের ফাইট করার রেকর্ড মোটেও সম্মানজনক নয়, রানা। সব খবরই আমরা রাখি। বহু চেষ্টা করেও তাকে তোমরা গ্রেফতার করতে পারোনি। সে-ই তোমাদেরকে বারবার

ঘোল খাইয়েছে।'

'তুমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছ, বেনিন।' রানা শান্ত।

'দুঃখিত।' গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলল বেনিন, চকচকে টাকে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবল ক'সেকেন্ড। 'তুমি "অশুভ চক্রান্তের শিকারের" ঠিকানা চাও, কেমন? সেক্ষেত্রে তোমাকে কুরিল দ্বীপে যেতে হতে পারে, রানা। কারণ আমাদের জানা মতে ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে ওরা। সম্ভবত প্রাচীন এক বৌদ্ধমন্দিরে। কিন্তু ওখানে তুমি যাবে কিভাবে? কুরিল এখন রাশিয়ার দখলে, তাই না? রুশ সরকার ইদানীং ওই দ্বীপে ট্যুরিস্টদেরও যেতে দিচ্ছে না। আমি সুপারিশ করে দেখতে পারি, তবে সরকার অনুমতি দেবে কিনা বলতে পারি না।'

'ওদিকটা আমি সামলাব,' সিআইএ চীফ বললেন। 'তবে তার আগে দেখতে হবে কুরিলে যাবার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না।'

তিনি থামতেই পাশের টেবিলে একটা ফোন বেজে উঠল। সিআইএ-র একজন কর্মকর্তা রিসিভার তুলে কথা বলল। 'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্যান্ডফোর্ডকে বলল, 'স্যার, আমাদের ফিল্ড অফিসাররা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে, বলছে এখুনি ওটা আপনার দেখা উচিত।'

রিপোর্টটা পৌঁছাল। চোখে চশমা এঁটে পাঁচ মিনিট ধরে সেটা পড়লেন স্যান্ডফোর্ড। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুললেন। 'ওরা পালিয়েছে, মি. রানা। সন্দেহের প্রায় কোন অবকাশই নেই। ছ'টা প্রাইভেট প্লেন সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে আমাকে, ওখান থেকে পোর্টল্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন এয়ারপোর্টে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ছ'টা প্লেন, ছ'টা আলাদা চার্টার সার্ভিস। তবে এক মাস আগে ভাড়া করেছে একজনই। মি. কিয়াংশি।'

গম্ভীর হলো রানা। নিয়তি বোধহয় ওকে ওই সুমো কুস্তিগিরের

grohon.com

সঙ্গে লড়তে বাধ্য করবে।

'প্রথম দিকে প্রতিবার অল্প করে দূরত্ব পেরিয়েছে ওরা,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'এক প্লেন ছেড়ে আরেক প্লেনে উঠেছে, তারপর সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় গেছে, সেখান থেকে আলাস্কা হয়ে ঢুকেছে রাশিয়ায়–ব্যস, এ-পর্যন্ত ট্র্যাক করা গেছে, তারপর কোন্ জাহান্নামে গেছে কে জানে!'

'জাহান্নামে নয়, সোজা কুরিলে গেছে ওরা,' বলল বেনিন। 'নিজেদের নিরাপদ ঘাঁটিতে। কলকাঠি যা নাড়ার ওখান থেকেই নাড়বে এখন।'

'হুম।' ভুরুর ওপর কপালটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন স্যান্ডফোর্ড। 'আপনি কি বলেন, মি. রানা? কুরিলে হানা দেয়া উচিত?'

'আমি আরেকবার সাবধান করে দিচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল বেনিন। 'রুশ সরকারের কাছে কুরিল সাঙ্ঘাতিক স্পর্শকাতর দ্বীপ। যতই অনুরোধ করা হোক, দলবল নিয়ে ওখানে পা রাখার অনুমতি পাবেন না। আর অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'কুরিলে কাউকে যদি পাঠাই,' সিআইএ চীফ প্রশ্ন করেছেন, তার জবাব দিচ্ছে রানা, 'মাত্র একজনকে পাঠাব, তাও গোপনে। রুশ সরকার অনুমতি দেবে না, এটা ধরে নিয়ে অনুমতি আমরা চাইবই না। চাইলে অনুমতি পাই বা না পাই, অন্যদিক থেকে ক্ষতি একটা হবেই–কুরিলে কেউ যাচ্ছে, এই খবরটা পৌঁছে যাবে কবীর চৌধুরীর কানে।'

'তারমানে তুমি বলছ রুশ প্রশাসনে কবীর চৌধুরীর চর লুকিয়ে আছে?' বেনিনের ভারী গলা আরও ভারী শোনাল।

'ইতিহাস বলে শুধু প্রশাসনে নয়, ক্রেমলিনেও কবীর চৌধুরীর শুভানুধ্যায়ী আছে–প্রায়ই তারা পরস্পরের সঙ্গে উপকার বিনিময় করে।'

'ঝামেলা বেশি না বাড়িয়ে, কুরিলে গোপনে যাওয়াই সবদিক

থেকে ভাল,' বলল তানাকা তাকাওশি। 'রানা, তোমাকে আমরা জাপানি জেলের ছদ্মবেশে ওখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব। কুরিলের আশপাশে আমাদের জেলেরা রোজই মাছ ধরতে যায়। এভাবে গেলে সিক্রেট সোসাইটির ওরা কিছু টেরই পাবে না।'

হেসে ফেলল রানা। 'ধন্যবাদ, তাকাওশি। তবে এখনও ঠিক করিনি আমি যাব, নাকি অন্য কাউকে পাঠাব।'

'গেলে তোমারই যাওয়া উচিত,' বলল বেনিন। 'যদি জানতে চাও, আমার কাছে দুটো যুক্তি আছে।'

'কি যুক্তি?'

'এক,' বলল বেনিন, 'কবীর চৌধুরী বাংলাদেশী প্রোডাক্ট, মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে–আরেকজন বাংলাদেশী হিসেবে তোমারই দায়িত্ব তাকে ধ্বংস করা। দুই, এটা একটা বিপজ্জনক অভিযান হতে যাচ্ছে, লীডার হিসেবে ঝুঁকিটা তোমারই নেয়া উচিত।'

'কে যাবে সেটা আমি পরে ঠিক করব,' বলল রানা। 'তবে কে কি ধরনের সাহায্য করতে পারবে সেটা এখুনি আমি জানতে চাই। যে যাবে তার তো ব্যাকআপ থাকতে হবে।'

'প্রশাসনকে ধরে সরকারী সুযোগ-সুবিধে আদায় করা অত্যন্ত ঝামেলার কাজ,' বলল বেনিন। 'কাজেই ওদিক থেকে আমি তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। তবে পদাতিক ও নৌবাহিনীর সঙ্গে আমার বসের খাতির আছে, আমি অনুরোধ করলে সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা পাওয়া যাবে। এমনকি সাবমেরিনের ব্যবস্থাও করা সম্ভব।'

'ধন্যবাদ।'

'লীডার হিসেবে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত,' স্যান্ডফোর্ড রানাকে বললেন। 'তবে আমি চাই কুরিলে আপনিই যান, মি. রানা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যে-ই যাক, সিআইএ-র স্পেশাল ইফেক্টস টীম তাকে সাজিয়ে দেবে। থ্যাঙ্ক ইউ,

grohon.com

grohon.com

জেন্টলমেন, আজকের মত আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।'

পাঁচ

YALTA চুক্তির কারণে কুরিল দ্বীপপুঞ্জের মালিক এখন রাশিয়া হলেও, এ বিষয়ে জাপানের সঙ্গে তাদের বিরোধ এখনও মেটেনি। রাশিয়ার দখলে থাকা সত্ত্বেও দ্বীপগুলোর জলসীমায় প্রায় একচেটিয়া ভাবে মাছ ধরে জাপানিরা। আকারে বেঁটেখাট হলেও ইস্পাতের মত শক্ত শরীর, তার ওপর অকুতোভয় ও স্বাধীনচেতা, ফলে রুশদের জন্যে এই জাপানি জেলেরা বিরক্তিকর একটা সমস্যা। জাপানের একেবারে ডগা থেকে গিঁটসর্বস্ব লম্বা একটা আঙুলের মত বিস্তৃত দ্বীপগুলো, রাশিয়ার নিচের দিকটা চিহ্নিত করছে। বেরিং সাগরের হিম স্রোত বইছে চারপাশে। বছরের বেশির ভাগ সময় ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে।

নৌকাটা ছোট। একটাই জাল। জালটা এইমাত্র তোলা হলো। জেলেদের একজন মাছগুলোকে পাটাতনের নিচে চালান করে দিল। বাকি দু'জন নতুন আরেকটা জাল ফেলছে পানিতে। তিনজন ওরা। জাপানি জেলে। স্রোতের টানে নৌকাটা দ্বীপগুলোর দিকে এগোচ্ছে।

তিনজনের মধ্যে একজন বুড়ো। বুড়ো কুঁজো হলেও শক্তসমর্থ, নৌকা নিয়ে একাই সাগর পাড়ি দেয়ার শক্তি ও সাহস রাখে। আরেকজনের বয়স বিশ কি একুশ, আজকের অভিযানে তাকেই হাল ধরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বুড়োর ছেলে সে।

তৃতীয় লোকটা জাপানিদের তুলনায় আকার-আকৃতিতে বড়। আসলে সে জাপানি নয়, আর জেলে তো নয়ই।

বাকি দু'জনের মত রানাও অয়েলস্কিন পরেছে, তার নিচে জাপানি শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ট্রাউজার। ছদ্মবেশে কোন খুঁত রাখা হয়নি–চোখের নিচে চামড়ার ভাঁজ, গায়ের রঙ হলদেটে, নাকটা প্রায় চ্যাপ্টা–তীর থেকে দেখে জাপানি জেলেই মনে হবে। বাপ-বেটাকে যা বলার বলে দিয়েছে মেজর তাকাওশি: রোজকার রুটিন ধরে নিজেদের কাজ করে যাবে ওরা, শুধু রানা কোন নির্দেশ দিলে সেটা পালন করতে হবে, সেই নির্দেশ যতই অদ্ভুত শোনাক না কেন।

প্রথম দিন সকালের দিকে যতক্ষণ কুয়াশা থাকবে মাছ ধরে সময় কাটাবে ওরা। বেলা বাড়বে, কুয়াশা কাটবে, আর তখন রোদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করবে নৌকা। এক সময় জাল মেরামত করতে বসবে বুড়ো আর তার ছেলে, পাটাতনের নিচে শরীর লুকিয়ে শুধু মুখটা বের করে রাখবে রানা। দ্বীপগুলোর চারপাশে ঘোরাফেরা করবে নৌকা, সেই সুযোগে খুঁটিয়ে দেখে পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবে ও।

তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। ছোট একটা দ্বীপকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, সূর্য দিগন্তের কাছে নেমে গেছে, গাছপালার ভেতর কি যেন একটা ঝিক করে উঠল। নিশ্চয়ই কোন ফিল্ড গ্লাসে রোদ লেগেছে।

দ্বীপের তীর থেকে ঢাল শুরু হয়েছে, গাছপালায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঢাকা, প্রায় একশো গজ প্রশস্ত। 'দ্বীপটাকে আরেকবার চক্কর দাও,' নৌকার তলা থেকে বুড়োকে বলল রানা।

চক্কর দিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা। রানা এখন বো-র কাছে স্তূপ করা জালের ওপর বসে আছে। কাঁচের ওপর আরেকবার রোদ প্রতিফলিত হতে দেখল ও। নৌকা থামল

grohon.com

না, দ্বীপটাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর চলে এল। সূর্য ডুবল, সন্ধে নামল, বাপ ও ছেলেকে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে খাওয়াল রানা; তারপর বলল, আবার ওই দ্বীপটার কাছে নিয়ে চলো। জেলেরা কথা না বলে নৌকা ঘুরিয়ে নিল।

গাঢ় অন্ধকারে কোন সমস্যা হলো না। জেলেরা পথ চিনে ঠিকই ফিরে এল। চাঁদ উঠেছে, তবে এখনও সেটা এত নিচে যে দেখার সুযোগ হয়নি। 'এবার তোমরা বাড়ি ফিরে যাও,' নৌকা থেকে পানিতে নেমে বুড়োকে বলল রানা, অয়েলস্কিনটা খুলে রেখে যাচ্ছে।

বৈঠার শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। জোয়ার শুরু হতে যাচ্ছে, সাঁতার কেটে দ্বীপে উঠতে রানার কোন সমস্যা হলো না। ছোট্ট, সরু সৈকত ঢাকা পড়ে আছে ছোটবড় বোল্ডারে। খানিকটা হেঁটে শুকনো ঘাসে থামল রানা। পকেট থেকে মোজা বের করে জুতো পরল আবার। জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে কান পাতল। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আর কোন শব্দ নেই। এমনকি সাগরও আজ শান্ত; নিঃশব্দে ফুলছে।

ঢালটাকে খুব একটা খাড়া বলা চলে না। একশো গজ হাঁটার পর সামনে কাঁপা কাঁপা আলোর আভাস দেখতে পেল রানা।

কুঁজো হয়ে এগোল ও। অসংখ্য পাথরের বেঢপ আকৃতি দেখে প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না। একেবারে কাছে আসতে দেখল পাথরগুলো আসলে প্রাচীন কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তবে জায়গাটা পরিত্যক্ত নয়। খানিক পরপর নতুন পাথরের পাঁচিল ও স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে, গর্তগুলোর ওপর ফেলা হয়েছে পুরু কাঠের তক্তা। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গাছপালার ভেতর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে গেছে। ওদিকে ছাদ দেখা যাচ্ছে, সদ্য মেরামত করা হয়েছে বলে মনে হলো, কিনারায় পানি নিষ্কাশনের জন্যে পাইপ। খিলান আকৃতির প্রবেশপথ, তবে দরজা বা কবাট নেই। একটা লোককে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসতে

দেখা গেল। অন্ধকারে স্রেফ একটা ছায়া। চাঁদ দেখা না গেলেও তার আলো আছে, সেই আলোয় ছায়ামূর্তিটাকে পূর্ণাঙ্গ বা নিখুঁত মনে হলো না। লোকটা যেন খোঁড়াচ্ছে। পাঁচিলে গাঁথা একটা হোল্ডারের সঙ্গে টর্চ রয়েছে, সেটা জ্বালল সে, তারপর মন্দিরের এক পাশ ঘেঁষে পিছনদিকে চলে গেল। লোকটা সম্ভবত জাপানি।

আরও দশ মিনিট নিরবে মশার কামড় খেলো রানা। এবার ছাদের নিচে থেকে বেরিয়ে এল দু'জন সন্ন্যাসী বা পুরোহিত। পরনে একখণ্ড গেরুয়া, ন্যাড়া মাথা। কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে আবার তারা ফিরে গেল।

কাঠ ও পাথরের পাঁচিলে ফাটল আছে, সে-সবের ভেতর টর্চের আলো আর লোকজনের নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। সুর করে সম্ভবত মন্ত্র পড়া হচ্ছে ওখানে, কিংবা ধর্মীয় সঙ্গীতের অনুশীলন চলছে। ডিউইটকে নিয়ে কবীর চৌধুরী এখানে থাকলে তার বুদ্ধির প্রশংসাই করতে হবে, কারণ আত্মগোপন করার জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। অশুভ চক্রান্তের শিকারদের একজন আইডেনটিফিকেশন লকেটটা ডিউইটের বাড়িতে ফেলে না এলে দশ বছর চেষ্টা করেও এই জায়গা রানা খুঁজে পেত না। সন্দেহ নেই, সত্যি যদি এখানে থাকে এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছে কবীর চৌধুরী। শুধু বিনকিউলারের সাহায্যে মাছ ধরার নৌকাগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। পাহারা দেয়ার জন্যে একজন গার্ডও রাখেনি।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে পাঁচিলটার দিকে এগোল রানা। হঠাৎ মন্ত্রপাঠ থেমে গেল। পাঁচিলে পিঠ ঘষে, অন্ধকার খিলান হয়ে, গাঢ় ছায়ার ভেতর চলে এল ও। ঢোকার মুখে মেঝেটা কাঁচা। মন্দিরের আরও ভেতরে ঢোকার আগে খিলানের পাশে ছোট্ট রিলে পাওয়ার প্যাকটা নামাল রানা। আলো না জ্বাললে জিনিসটা কারও চোখে পড়বে না। সুইচটা অন করতে খুট করে একটা শব্দ হলো।

ওখানে দাঁড়িয়ে নারী ও পুরুষ গলা শুনতে পাচ্ছে রানা।

মন্দিরের ভেতর লোকজন হাঁটাচলা করছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে আবার এগোল ও। কাঁচা মেঝে ধরে ভালই এগোচ্ছে, বিপত্তি ঘটল প্রথম পাথরটায় পা দিতে। খিলান পেরিয়ে আসার পর মেঝেতে এই একটাই পাথর পেয়েছে রানা। চ্যাপ্টা, সমতল ও চওড়া একটা পাথর; সামনে এগোতে হলে পা রাখতে হবে ওটায়। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রানা কেন ওরা পাহারার ব্যবস্থা করেনি। পাথরটা কোন ধরনের সুইভেল যন্ত্রের ওপর বসানো, চাপ পড়তেই নেমে গেল সামনের দিকটা। পাথরের ওপর হড়কে গেল রানা, ঝপ করে খসে পড়ল অদৃশ্য একটা গর্তের ভেতর।

যতই অপ্রত্যাশিত আর আকস্মিক হোক পতনটা, বড় একটা ঘরের পাকা মেঝেতে রানা যখন পা দিয়ে পড়ল, ওর হাতে ল্যুগারটা বেরিয়ে এসেছে। চার ধার থেকে ছু: এল লোকজন। একদিকের পুরো দেয়ালটাকে অদ্ভুত মনে হতে সেদিকে একবার তাকাল রানা। এক সেকেন্ড দেরি হলেও ভুলটা ভাঙল, ওটা দেয়াল নয়; দেয়াল প্রায় পুরোটা ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সুমো কুস্তিগির কিয়াংশি।

রানা পড়েছে মাঝখানের একটা ঘরে। ঘরটা ফাঁদ। ফাঁদে কেউ ছিল না। লোকজন আসছে চারপাশের কামরা থেকে, প্রত্যেকের হাতে হয় চকচকে ছোরা, নয়তো নাঙ্গা তরোয়াল। কোনভাবেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে মরবেই যখন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়েই মরবে রানা।

গুলি করায় কাজ হলো। ছিটকে সরে গেল লোকজন, আহত হয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে অনেকে। তিনজনকে পড়ে যেতে দেখল রানা। কিয়াংশি ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল, গুমরটা ফাঁস হলো দেয়াল ঘেঁষা বিশাল গর্তটার ওপর কাঠের ঢাকনি সশব্দে নেমে আসতে। গর্ত হয়ে অন্য কোন ঘরে পালিয়েছে সে।

দেয়ালে ফিট করা টর্চের আলো ঘরের অন্ধকার সবটুকু দূর করতে পারেনি। গুলি হবার পর যারা ঘর থেকে বেরুতে পারেনি, গাঢ় ছায়ার ভেতর লুকিয়ে আছে তারা। নতুন করে হামলা হচ্ছে না, ফাঁকা একটা দরজা দেখে ছুটল রানা। পাশাপাশি দুটো ঘর, পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরুবার আগে আরও দুটো গুলি করতে হলো। তবে বেরিয়ে কোন লাভ হলো না। আশপাশে দরজা দিয়ে তেড়ে এল সন্ন্যাসীরা। কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল দুটো ছোরা, একটা জুতোর পিছনে মাটিতে গেঁথে গেল। পাঁচিলটা এখনও অনেকটা দূরে, সন্দেহ হলো পৌঁছতে পারবে কিনা। কোত্থেকে কে জানে সামনে উদয় হলো প্রকাণ্ডদেহী দু'জন সন্ন্যাসী, কারাতের ভঙ্গি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছে। হঠাৎ পিছন থেকে গুলি হলো। বুলেট লাগেনি, রানা শুধু অনুভব করল মাথায় হাত বোলাল কেউ, সেই সঙ্গে নাকে ঢুকল চুল পোড়ার গন্ধ।

সামনে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে দুই সন্ন্যাসী। ইতস্তত করছে রানা। দু'জনকে একসঙ্গে কাবু করা সম্ভব নয়। শুধু পিছন থেকে নয়, দু'পাশ থেকেও সন্ন্যাসীরা ঘিরে ফেলছে ওকে।

রিলোড করার সময় পাওয়া যাবে না, ল্যুগারে বুলেট আছে আর মাত্র একটা। এটাই হয়তো জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত করার আগে চারদিকটা একবার দেখে নিচ্ছে রানা। দুই সন্ন্যাসীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল ও। হাতের পিস্তল ধীরে ধীরে তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল সচল বাড়ির মত বিশাল কিয়াংশির বাম বুকে। বাকি সব লোককে পিছনে ফেলে রানাকে ধরতে আসছে সে।

ছুটন্ত একটা ট্রেন বললেই হয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তল তোলার সময়টুকুই শুধু পেল রানা, সামনের সমস্ত দৃশ্য আড়াল করে একেবারে কাছে চলে এল কিয়াংশি। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রানা গুলি করছে না। থলথলে চর্বি আর মাংসের এমন বিপুল সমাবেশ আগে কখনও দেখেনি রানা। বিশেষ করে বুক আর পেট, নিতম্ব আর উরু একেকটা জ্যান্ত প্রাণীর মত মোচড় খাচ্ছে।

grohon.com

grohon.com

আঘাতটা এল পিছন থেকে। সন্ন্যাসীদের একজন সামনে না এসে পা ঘুরিয়ে কৌশলে লাথি মারল পিস্তল ধরা হাতটায়। কব্জিটা হয়তো ভাঙেনি, তবে মুঠো থেকে ল্যুগারটা বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে নরম ও পিচ্ছিল মাংসের পাহাড় আলিঙ্গন করল রানাকে।

নিঃশ্বাস ফেলা যাচ্ছে না। মাংসের দেয়ালে সেঁটে আছে নাক, মুখ ও চোখ। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার অনুভূতি আতঙ্কিত করে তুলল রানাকে। কঠিন আলিঙ্গনের ভেতর হাত আর পা দুটোও পুরোপুরি সেঁধিয়ে গেছে, এক চুল নাড়া যাচ্ছে না।

তারপর চাপ বাড়তে লাগল। নরম মাংসের ভাঁজ ধীরে ধীরে লোহার মত শক্ত হয়ে উঠছে। কল্পনায় মট মট করে হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল রানা। এরকম কঠিন মৃত্যুর কথা কখনও ভাবেনি ও। শরীরটাকে মোচড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, পেশিগুলোকে আরও শক্ত করল কিয়াংশি। নিজেকে রানার অতি অসহায়, বেদনাদায়ক দুর্ভাগ্যের শিকার বলে মনে হলো। ছুরিটার কথা মনে পড়ল। সঙ্গেই আছে, নাগালের মধ্যেই, কিন্তু নাগাল পাবার মাধ্যম হাত দুটোর ওপর ওর নিয়ন্ত্রণ নেই।

বুক আর পিঠের হাড়গুলোই প্রথমে ভাঙবে। ভাঙার আগেই প্রচণ্ড চাপে অসহ্য ব্যথা অনুভব করল রানা। অক্সিজেনের অভাব আর আতঙ্কে এতক্ষণে জ্ঞান হারাবার কথা ওর, ব্যথাটাই ওকে সচেতন থাকতে বাধ্য করছে। পেশিতে ঢিল দিল রানা, প্রতিপক্ষকে বুঝতে দিল পরাজয় মেনে নিয়েছে।

কিন্তু স্বস্তিকর বা আরামদায়ক কিছু ঘটল না। বাতাসের অভাব তো আছেই, সেই সঙ্গে চারপাশের চাপে বুক আর পিঠ গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে। এরকম অবস্থায় অতি সাহসী মানুষও পরিত্রাণ পাবার আশায় নিজের মৃত্যু কামনা করে। রানাও তাই করল।

ছয়

জানত মৃত্যু হয়েছিল, জ্ঞান ফেরার পর ভুলটা ভাঙল। মাঝখানে কতটা সময় বয়ে গেছে বলতে পারবে না—পাঁচ ঘণ্টা, নাকি পাঁচ মিনিট? জ্ঞান ফিরছে ধীরে ধীরে, অন্ধকার থেকে একটু একটু করে আলোয় ফিরে আসা। মুখে, কপালে ও বুকে কোমল হাতের স্পর্শ। কে রে? কার এত আদর? ভেজা তুলো বা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে ওকে। কোথায় ও? এত যত্ন করছে কে? একটা দুঃস্বপ্ন, একটা বিভীষিকার মত কিয়াংশির কথা মনে পড়ে গেল। ঝট করে চোখ মেলল রানা।

যত্ন বা আদর নয়, ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ওর মেকআপ তুলছে কুৎসিতদর্শন এক বৃদ্ধা। কনুইয়ের নিচে থেকে তার বাম হাতটা নেই, কাটা জায়গাটায় ঘা দগদগ করছে। এতক্ষণে রানা অনুভব করল হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুই গোড়ালিও এক করে বাঁধা। জায়গাটাকে ঘর বলে মনে হলো না, যেন বিশাল এক গুহা, মশালের আলো সবগুলো পাঁচিল বা দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

কাছাকাছি দেয়ালটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিয়াংশি। এই প্রথম তাকে সময় নিয়ে লক্ষ করার সুযোগ পেল রানা। দেখে আশ্চর্যই হলো। এ অন্য রকম একটা বিস্ময়। কিয়াংশি দৈত্য নয়, দানব নয়, পাহাড়ও নয়, এ-সবের চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর সে, অথচ শিশুসুলভ সরল একটা মুখের অধিকারী, দেখে ভাবাই যায় না এই লোকের দ্বারা কারও কোন

grohon.com

ক্ষতি হতে পারে। বুদ্ধিহীন প্রতিবন্ধী? রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে, সেই হাসিতে না আছে বিদ্বেষ, না গর্ব। কিয়াংশি যেন নিজের শক্তি সম্পর্কেও সচেতন নয়।

কিয়াংশির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে খর্বকায় আরেক জাপানি। অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসরের মত দেখতে, নাকের ডগা থেকে চশমাটা যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। রানা ধারণা করল, এই লোকটাই সম্ভবত ইয়াকোমো, কবীর চৌধুরী আর কিয়াংশির সঙ্গে কামবারল্যান্ডে গিয়েছিল।

ইয়াকোমোর পাশে ইভা। কালো স্ল্যাকস আর হলুদ জার্সি টপ পরে আছে। ক্লিনটন ডিউইট দাঁড়িয়ে আছেন ওদের থেকে একটু দূরে। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়, পায়চারি করছেন তিনি। সিআইএ চীফ ওকে তাঁর ফটো দেখিয়েছেন, চিনতে অসুবিধে হলো না।

কে.সি বা কবীর চৌধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ইভার পিছনে আরেকজন জাপানি লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা। তার হাতে ওর ল্যুগারটা রয়েছে। কনুইয়ের ওপর ছুরিটা জায়গা মতই আছে, অনুভব করল ও। গুহার ভেতর আরও অনেক লোক রয়েছে, আলো ও ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। কি কারণে বলতে পারবে না রানা, লোকগুলোকে অদ্ভুত মনে হলো ওর।

বেশিরভাগই পুরুষমানুষ। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক। দু'তিনজন বৃদ্ধা, পাঁচ-সাতজন তরুণী। সবার চোখেই কাতর দৃষ্টি, ভূতে পাওয়া বিহ্বল অবয়ব। বেশ কয়েকজন পঙ্গু। রানার মুখ থেকে মেকআপ মুছে সিধে হলো বুড়িটা, ধীর পায়ে পিছু হটল।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর পিছনে কয়েকটা করিডরের অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে রানা, মন্দিরের মূল অংশ থেকে দূরে চলে গেছে।

দূরে একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে, দেয়াল ঘেঁষা বেদির ওপর কয়েক সারিতে অস্বাভাবিক বড় আকৃতির মোমবাতি জ্বলছে।

বেদি মানে লম্বা, উঁচু, চ্যাপ্টা একটা পাথর, সেটার পিছনে ঝুলছে অদ্ভুতদর্শন একটা স্কাল্পচার-তোবড়ানো, মোচড়ানো, প্যাঁচানো, পুড়িয়ে কালো করা ধাতব ও হাড়ের সমষ্টি। ডিউইটের কণ্ঠস্বর রানার মনোযোগ দাবি করল।

'ইনিই কি ইভাকে নিয়ে আসার সময় তোমাকে বাধা দিয়েছিলেন?' কিয়াংশিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। উত্তরে হেসে উঠল কিয়াংশি, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'আপনি যে-ই হন, আমাদের এই আস্তানা খুঁজে পেয়েছেন দেখে আপনার প্রশংসা না করে পারছি না,' রানাকে বললেন ডিউইট। 'কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন?'

'আপনি বরং আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' বলল রানা। 'ভাইরাস X-99 কোথায়?'

'এখানেই আছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে জবাব দিলেন ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট।

ইভার দিকে তাকিয়ে চায়না-ব্লু চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল রানা। তার মধ্যে অনিশ্চিত একটা ভাব লক্ষ করল ও। আবার ডিউইটের দিকে তাকাল। 'এবার থামুন, ডিউইট। এরই মধ্যে আপনারা বিশ-পঁচিশজন মানুষকে খুন করেছেন,' বলল ও, দেখল ঝট করে মামার দিকে তাকাল ইভা-তার চেহারায় বিস্ময় ও অবিশ্বাস।

রানার সঙ্গে কথা বলছেন ডিউইট, যদিও আসলে ভাগ্নীর প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাব দিচ্ছেন, 'বড় কিছু অর্জন করতে হলে অনেক ছোটখাট ব্যাপারেই চোখ বুজে থাকতে হয়।'

'বড় অর্জনটা কি?'

'বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আমরা বিজ্ঞানের অপব্যবহার বন্ধ করতে বাধ্য করব।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখালেন ডিউইট। 'এখানে যারা রয়েছে

grohon.com

প্রত্যেকে তারা বিজ্ঞানের অপব্যবহারের শিকার। এই অপব্যবহার এখুনি যদি বন্ধ করা না হয়, মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে...''

'কিন্তু আমি তো মাংসের পাহাড়টাকে দিব্যি সুস্থ-সবলই দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা।

'মি. কিয়াংশির মা-বাবাও, আরও অনেকের মত, বোমা ফেলার সময় হিরোশিমাতে ছিলেন। তখন তারা শিশু। বাইরে থেকে তেমন বোঝা যায়নি তাদের আদৌ কোন ক্ষতি হয়েছে কি না। ত্রিশ বছর পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম হয়। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করেন তাঁরা। সাত বছর পর প্রথম সন্তান কিয়াংশি জন্ম নেয়। পরিণত বয়সে জানা গেল যে, সে সন্তানের জন্মদানে সক্ষম নয়। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলল, তেজস্ক্রিয়তার কারণে বাবার বীর্যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল, তারই ফলে মি. কিয়াংশির জিন বদলে গেছে, সেজন্যেই ও কখনও সন্তানের পিতা হতে পারবে না।

'শুধু ও নয়। এখানে শ্রমিক, সামরিক অফিসার ও বিজ্ঞানীরা রয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার সময় তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছেন সবাই। কিছু সৈনিক আছে, নার্ভ গ্যাস ওদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আছে জেলেরা, ইনসেক্টিসাইড-এর দ্বারা দূষিত মাছ খেয়ে পেটের ক্যানসারে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

'সব মিলিয়ে আড়াইশো মানুষকে এখানে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। বিভিন্ন জনপদ থেকে এসেছে ওরা–ভূপাল, চেরনোবিল, টেক্সাস, ককেসাস, লাহোর, পিয়ংইয়ং, বাগদাদ। ককেসাসের কথাই ধরুন। রুশ একটা প্লেন ওদিকের পাহাড়ে বিধ্বস্ত হলো, কন্টেইনার ভেঙে যাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল মারাত্মক একটা ব্যাকটিরিয়োলজিকাল ভাইরাস। দু'হাজার মানুষ মারা পড়ল। গোটা ব্যাপারটা চেপে গেল ক্রেমলিন সরকার। আমেরিকার টেক্সাসে একই ধরনের ঘটনায় মারা গেল পাঁচ হাজার

ভেড়া-ভেড়ার জায়গায় অনায়াসে মানুষ মারা যেতে পারত।'

'কিন্তু আপনি একজন বিজ্ঞানী, আপনার প্রতিবাদের ভাষা বা পদ্ধতি এরকম হিংস্র হবে কেন? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন, এভাবে চেষ্টা করলে কি জীবাণুযুদ্ধের প্রস্তুতি আপনারা থামাতে পারবেন?'

'আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা নেই, তাই এ-কথা বলছেন। সফল আমরা হবই।'

'প্রয়োজনে লাখ লাখ কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে খুন করে হলেও?'

'লোকটা বেশি কথা বলছে,' একেবারে শিশুর মতই চিকন কণ্ঠস্বর কিয়াংশির। 'বস্ থাকলে জিজ্ঞেস করতাম ওকেও ধীরে ধীরে মারা যাবে কিনা।'

বহুবচনের ব্যবহার লক্ষ করলেও অন্য একটা জরুরী প্রশ্ন উঠে এল রানার মনে। ডিউইটকে জিজ্ঞেস করল, 'কে.সি বা কবীর চৌধুরীকে দেখছি না যে?'

'এ-সব ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় তাঁর!' বললেন ডিউইট। 'এখানেই আছেন, নিজের কাজে ব্যস্ত।'

'কবীর চৌধুরীকে আপনি কতটুকু চেনেন, তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, কিছুই আমি জানি না,' বলল রানা। 'সাবধান হওয়া না হওয়া আপনার ব্যাপার, আমি শুধু সৎ পরামর্শ দিতে পারি। এর আগেও অনেক বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় কিছু অর্জন করতে চেয়েছিলেন–আপনারই মত। সফল তো হনইনি, আজ কেউ তাঁরা বেঁচেও নেই। মানবকল্যাণের নামে, বৃহত্তর স্বার্থের অজুহাতে বন্ধুকে খুন করতেও তার হাত কাঁপে না!'

হেসে উঠলেন ডিউইট। 'কিছু লোকের স্বভাবই হলো মহৎপ্রাণ, দেবতুল্য, নমস্য ব্যক্তির কুৎসা গাওয়া–আপনি দেখছি তাদেরই একজন।' হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, ইভা আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেঝের দিকে।

grohon.com

রানা ভাবছে, পালাবার সুযোগ যদি পাওয়া যায়, হয়তো ওর একমাত্র ভরসা ওই চুপচাপ মেয়েটা আর কনুইয়ের ওপর ছুরিটা।

'জরুরী একটা কাজে আমাদেরকে চলে যেতে হচ্ছে,' ভাগ্নীকে বললেন ডিউইট, একটা হাত রাখলেন কাঁধে। 'আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই মন্দিরে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে তুমি। সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ মার্কিন বা আর কোনও সরকার কিছুই করছে না। এই মুহূর্তে আমাদের মিশন একটা ক্রিটিকাল পর্যায় অতিক্রম করছে, মাই ডিয়ার। তবে নত ওদেরকে হতেই হবে।' আদর করে ভাগ্নীর কপালে চুমো খেলেন।

রানা লক্ষ করল, কিয়াংশি একটু সরে দাঁড়িয়েছে। চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, ও অনুভব করল গোপন কি যেন একটা সিদ্ধান্ত আছে তার।

'আমার বন্ধু তো নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবেন,' কিয়াংশিকে বললেন ডিউইট। 'এখানকার চার্জে কাকে রেখে যাচ্ছ তুমি?'

এক পা সামনে বাড়াল খর্বকায় জাপানি, অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর।

'ইয়াকোমো চার্জে থাকবে,' বলল কিয়াংশি।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে ডিউইটকে সম্মান জানাল ইয়াকোমো। কাজটা সেরে পিছু হটার সময় কিয়াংশির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সে। রানার সন্দেহ হলো, ডিউইটের অজ্ঞাতে কিছু একটা ঘটছে। নিজের জায়গায় ফিরে এসে চেইন-এর সঙ্গে ঝুলানো লকেটটা আঙুল দিয়ে নাড়ছে ইয়াকোমো।

'আমাকে নিয়ে কি করা হবে?' কেউ কিছু বলছে না দেখে বাধ্য হয়েই প্রশ্নটা করতে হলো রানাকে।

'আমার বস্ তোমার নিয়তি ঠিক করে রেখেছেন,' জবাব দিল কিয়াংশি। 'ফিরে এসে তোমার ব্যবস্থা আমিই করব।'

ইভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন ডিউইট। কিয়াংশি আর ইয়াকোমো ছাড়াও অপর একজন জাপানি

তাঁর পিছু নিল।

শেষ একটা চেষ্টা করল রানা। 'মি. ডিউইট, এখনও কিন্তু দেরি হয়ে যায়নি। বিশ্বাস করুন, গোটা দুনিয়াকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। কোনভাবেই আপনারা জিততে পারবেন না। কবীর চৌধুরীকে আমি সামলাব, আপনি শুধু ভাইরাস X-99 আমার হাতে তুলে দিন।'

দোরগোড়ায় ছায়ার ভেতর দাঁড়ালেন ডিউইট। 'আপনি প্রলাপ বকছেন। বিজয় আমাদের নিশ্চিত। কবীর চৌধুরী আর আমি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকব।'

অকস্মাৎ রোমহর্ষক একটা অট্টহাসি শোনা গেল, প্রকাণ্ড অন্ধকার গুহার ভেতর ধ্বনিটাকে ব্যঙ্গ করছে তারই প্রতিধ্বনি, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় কোনটা ধ্বনি আর কোনটা প্রতিধ্বনি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সেই ভরাট ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর আতঙ্কিত করে তুলল ঝাঁক ঝাঁক বাদুড়কে, পাখা ঝাপটে আর চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ নারী-পুরুষের দীর্ঘ লাইনটা একযোগে নড়ে উঠল, পরম শ্রদ্ধা ও সমীহের সঙ্গে ঘন ঘন কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াচ্ছে।

দোরগোড়ায় স্থির হয়ে গেছেন ড. ডিউইট আর তাঁর তিন জাপানি সঙ্গী; ধৈর্যের সঙ্গে, ব্যাকুল প্রত্যাশার সঙ্গে গুহার অন্ধকার দিকটায় তাকিয়ে আছে তারা।

অন্ধকার থেকে প্রকাণ্ড এক বাদুড়ের মতই বেরিয়ে এল কালো আলখেল্লা পরা একটা ছায়ামূর্তি, মশালের আলোয় রানা শুধু তার মুখটাই দেখতে পাচ্ছে।

'এত বড় স্পর্ধার কথা তোমার মুখেই বোধহয় মানায়–কবীর চৌধুরীকে আমি সামলাব!' অট্টহাসি থামিয়ে রানার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু সত্যি কি মানায়? বিজ্ঞান আমার ধর্ম, বিজ্ঞান আমার ঈশ্বর, আমি সেই ধর্ম আর ঈশ্বরের সাধনা করি, আর আমার সেই সাধনায় বাধা দেয়ার প্রতিজ্ঞার নাম

মাসুদ রানা। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা কি আজ পর্যন্ত সফল হতে পেরেছে? আগুনে ফেলোনি আমাকে? পানিতে ডোবাওনি? আমাকে লক্ষ্য করে খালি করোনি পিস্তলের চেম্বার? মরে গেছি ভেবে বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে ফিরে গেছ–একবার নয়, দু'বার বারবার। কিন্তু! হ্যাঁ, কিন্তু! কিন্তু এই দেখো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। চোখ, নাক, হাত, পা–সব হয়তো জন্মসূত্রে পাওয়া অবিকল নয়, কিন্তু যতই পরিবর্তিত হোক মানুষটা এখনও আমি সেই কবীর চৌধুরী আছি।' আবার শুরু হলো তার সেই রোমহর্ষক অট্টহাসি।

'তুমি যাকে প্রতিজ্ঞা বলে জানো,' কবীর চৌধুরীর হাসি থামতে যতটা সম্ভব নরম সুরে আবেদন জানাল রানা, 'আমি সেই মাসুদ রানা তোমাকে আজ কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যাই তুমি করো না কেন, আমি অন্তত তোমার কোন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াব না–বিনিময়ে আমার এই একটা অনুরোধ রাখো, ভাইরাসটা ফেরত দাও।'

'তোমার এটা একটা মস্ত দোষ, রানা,' কবীর চৌধুরী বলল। 'কিংবা হয়তো দুর্লভ একটা গুণ। কখনোই ভুলতে পারো না যে তুমি মাসুদ রানা। বন্দী হয়ে শুয়ে আছ মেঝেতে, অথচ তারপরও দর কষতে চাও আমার সঙ্গে! এ শুধু তোমাকেই মানায়, রানা!'

'তোমার বন্দী জানে এখানে, এখনই তার মৃত্যু হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু সেজন্যে সে ভীত নয়। সে যে অকারণে ভয় দেখাবার মানুষ নয়, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে না, তা-ও তোমার জানা আছে। অনুরোধটা করছি, তোমারও তাতে মঙ্গল হবে জানি বলেই করছি। এখনও সময় আছে, চৌধুরী। আমার কথা শোনো। ভাইরাসটা দাও। তুমি বাঁচো। দুনিয়ার মানুষ বাঁচুক।'

'যদি না দিই?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'তুমি আমার কি করতে পারো?'

'কি করতে পারি বলব না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না,' বলল রানা। 'শুধু এইটুকু বলি–জগৎ ও সংসার, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে যত রকম ব্যাখ্যাই দেয়া হোক, অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে উল্টোটা ঘটছে বলে মনে হলেও, আসলে চিরন্তন একটা সত্য কখনোই বদলায় না–শেষ পর্যন্ত যা কিছু ন্যায় ও শুভ, সত্য ও সুন্দর, তারই জয় হয়।'

'সেই পুরানো গৎ, শুনতে আর ভাল লাগে না,' কবীর চৌধুরী বিরক্তি প্রকাশ করল। 'এরপর বলবে তুমি ন্যায় ও সত্যের পথে আছ, আমি আছি অন্যায় আর অসত্যের পথে, কাজেই আমার পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য।' কথা শেষ করে ঘাড় ফেরাল সে, ড. ডিউইট আর কিয়াংশিকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। 'একি! আপনাদের না জরুরী একটা কাজে বেরুবার কথা? কিয়াংশি, এখনও তুমি ড. ডিউইটকে নিয়ে রওনা হওনি যে?'

জবাব দেয়ার আগে কবীর চৌধুরীর সামনে পাঁচবার মাথা নোয়াল কিয়াংশি। 'আমরা বেরিয়েই যাচ্ছিলাম, বস্। আপনার গলা চুম্বকের মত গ্রেফতার করে রাখল।'

কি যেন চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'ভাবছি জরুরী কাজটায় খুঁত রাখা উচিত হবে না। চলো, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাই।' দরজার দিকে এগোল সে, তার কালো আলখেল্লা পিছনে উড়ছে। 'এখানের কাজ ইয়াকোমোকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছ তো?'

'ইয়েস, বস্!' গুনে গুনে তিনবার মাথা নোয়াল কিয়াংশি।

'শেষবার বলছি, চৌধুরী!' চিৎকার করল রানা। 'তুমি...'

কিন্তু শুনল না, থামল না, সবাইকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী। দূর থেকে তার গমগমে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, রানা। কিন্তু জরুরী কাজ থাকায় তোমার মৃত্যুর সময় সামনে থাকতে পারলাম না। তুমি সত্যি আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলে।'

কবীর চৌধুরী, ডিউইট আর কিয়াংশিকে বিদায় দিয়ে গুহার

grohon.com

ভেতর একা ফিরে এল ইয়াকোমো। তবে থামল না, অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকা পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ লোকগুলোকে নিয়ে আবার চলে গেল সে।

রানার মনটা খুঁত-খুঁত করছে। কি যেন মিলছে না।

সেই একই জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ইভা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এঞ্জিনের শব্দে মন্দিরের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। হেলিকপ্টার। আওয়াজটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

'দুঃখিত...সত্যি আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা।

'আপনি চাইলেই আমাকে মুক্ত করতে পারেন,' দ্রুত বলল রানা। 'কেউ নেই, এখনই সময়। তাড়াতাড়ি, প্লীজ!'

চায়না-ব্লু চোখ গোল হলো, রানার প্রস্তাব শুনে একেবারে হকচকিয়ে গেছে ইভা। সে নড়েনি, তবু তার পিছিয়ে যাওয়াটা অনুভব করল রানা। 'দুঃখিত,' আগের মত নিচু গলায় বলল সে। 'এ আমি পারি না।'

'শুনুন, যদি বলি আপনার মামার বক্তব্য আমি সমর্থন করি, কিন্তু জানি উনি সফল হবেন না?' বলল রানা। 'আপনি আমাকে এখান থেকে বের করুন, ওঁকে আমি সাহায্য করব।'

'আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না,' বলল ইভা, উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে। 'শুধু মুখেই বলছেন, আসলে আপনি সমর্থন করেন না। তবে মামা কিন্তু ঠিক কাজটিই করছেন। জীবাণু যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে দুনিয়ার মানুষকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে।'

নিষ্ফল রাগে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। রাজনৈতিক বা দার্শনিক আলোচনার সময় নেই হাতে, অথচ মেয়েটার সাহায্য ওকে পেতেই হবে। 'ঠিক আছে, স্বীকার করছি উনি ঠিক পথে আছেন কি নেই তা আমি জানি না। তবে একটা কথা জানি। ঠিক কাজটা আপনি ভুল পদ্ধতিতে করতে পারেন না। সে চেষ্টা যদি করেন, কাজটার ভাল দিক যেটুকু আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার

মামা সেই সর্বনাশটাই করছেন। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে তিনি শুধু আইডিয়া ধ্বংস করছেন না, আইডিয়ার সঙ্গে রক্তপাত ঘটাচ্ছেন, পাইকারি হারে মানুষ হত্যা করতে যাচ্ছেন।'

রানার চোখে চোখ রেখে ঠোঁট কামড়াচ্ছে ইভা। রানার মনে আশা জাগল। কিন্তু ঠিক এই সময় ফিরে এল অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর ইয়াকোমো। একা আসেনি, সঙ্গে চারজনকে নিয়ে এসেছে—এক জোড়া করে তরুণ-তরুণী।

'ওকেও বাঁধো,' বলল ইয়াকোমো, শুনে প্রায় গুডিয়ে উঠল রানা। তরুণ দু'জন এগিয়ে এসে ধরল ইভাকে। ইভা বাধা না দিয়ে মুখ তুলে তাকাল শুধু। ভুরু কুঁচকে উঠেছে, কি ঘটছে এখনও বুঝতে পারছে না। তবে রানা জানে। ড. ডিউইটের আদর্শগত আন্দোলনে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী স্রোত আছে।

'কি করছ তোমরা?' হাত দুটো মুচড়ে পিছনে নিচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেল ইভা। 'এখুনি আমাকে ছাড়ো! কি হলো, ছাড়ো বলছি!'

জবাবে ঠাস করে ইভার গালে চড় মারল ইয়াকোমো। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে, রানার দিকে তাকিয়ে ইভা বলল, 'কি...কি ঘটছে?'

'সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি,' বলল রানা। 'ইয়াকোমো আর কিয়াংশি সহ এখানকার সব লোকজন "অশুভ চক্রান্তের শিকার" নামে একটা সিক্রেট সোসাইটির সদস্য। পদটা উপদেষ্টা বলা হলেও, তিন বছর ধরে কবীর চৌধুরীই ওদেরকে পরিচালনা করছে। যেভাবেই হোক এদের আনুগত্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সে, আর সেটাকে পুঁজি করে দুনিয়ার ছয়শো কোটি মানুষের জীবন নিয়ে ভয়ঙ্কর একটা খেলায় মেতে উঠেছে। সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তোমার মামা, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কবীর চৌধুরী তাঁকে দাবার ঘুঁটির মতই ব্যবহার করছে। ভাইরাস X-99 হাতে পাবার পর তোমার মামাকে তার আর

grohon.com

প্রয়োজন নেই।'

প্রথমে হাততালি দিল ইয়াকোমো, তারপর ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানার পাঁজরে। ঘুরে ইভার দিকে এগোল, হাত বোলাল তার দুই স্তনে। ধস্তাধস্তি শুরু করলেও কোন লাভ হলো না, দুই তরুণ শক্ত করে ধরে থাকল ইভাকে। দুই তরুণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে।

'তোমার মামা, ড. ডিউইট, আসলে একটা শিক্ষিত ছাগল,' ইভাকে বলল ইয়াকোমো। 'উনি কি চান? উনি চান দুনিয়ার মানুষকে জীবাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করাতে। আর আমরা, যারা ভুক্তভোগী, আমরা চাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতিশোধ নিতে। তাঁর আর আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া, বস্ বললেন, এক ধার মে দো পীর? কভি নেহি!' জাপানি দুই তরুণীর দিকে ফিরল। 'প্রথমে তোমরা বেদিটা রেডি করো, তারপর ইভাকে।'

ইভা ফোঁপাচ্ছে। তরুণরা তার দুই হাত পিছমোড়া করে আর দুই গোড়ালি এক করে বেঁধে ফেলেছে। রানার পাশেই ছুঁড়ে দেয়া হলো তাকে। ব্যথায় কাতরে উঠল বেচারি। কিছুক্ষণ পর কান্না থামিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। ইতিমধ্যে চার সঙ্গীকে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে চলে গেছে ইয়াকোমা। 'আমাদের নিয়ে কি করবে ওরা?' ভয়ে গলাটা বুজে এল ইভার।

'খুন,' বলল রানা, জানে মিথ্যে সান্ত্বনা বা অভয় দিয়ে কোন লাভ নেই। পাঁচ মিনিট পর দুই তরুণী ফিরে এল। একজন বেদির কাছে গিয়ে মোমবাতিগুলো নতুন করে সাজাচ্ছে—বেদির আরও কাছে সরিয়ে এনে পিছন দিকটায় অর্ধবৃত্তাকারে। এক একটা মোমবাতি রানার বাহুর সমান মোটা, লম্বায় প্রায় দুই ফুট।

দ্বিতীয় তরুণী একটা কাঁচি দিয়ে ইভার সব কাপড় কেটে ফেলল। এড়াবার চেষ্টা করলেও চোখাচোখি হয়েই গেল; ইভার চোখে ব্যথা, অপমান, বিষণ্ণতা আর অভিমানের ছায়া দেখতে

পেল রানা।

দুই তরুণী বিবস্ত্র ইভাকে ধরে দাঁড় করাল, ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বেদির কাছে। একটু পর অকস্মাৎ আতঙ্কের একটা ঢেউ অনুভব করল রানা—বেদির ওপর আয়োজনটা দেখতে পেয়েছে। পাকা ডালিমের মত গায়ের রঙ, শরীরে উথলানো যৌবন, বেদির সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ইভাকে। হাত ও পা থেকে রশি খুলে নেয়া হয়েছে, তারপর হাত-পা ফাঁক করে স্ট্র্যাপ পরানো হয়েছে গোড়ালি ও কব্জিতে। পাথুরে বেদির অনেকটা ওপরে সারি সারি মোমবাতি। ভারসাম্য রক্ষার উপযোগী তারের সঙ্গে ঝুলছে সারি সারি কাপ, উত্তপ্ত ও তরল মোম ঝরে ওগুলোতেই পড়বে। ইভাকে নিয়ে ব্যস্ত মেয়েদুটো লক্ষ করল আয়োজনটার ওপর স্থির হয়ে আছে রানার দৃষ্টি।

'আপনার অনুমান নির্ভুল,' তাদের একজন রানার দিকে ফিরে বলল। 'বাতিগুলো বিশেষ ধরনের মোম দিয়ে তৈরি—যতটা গরম হলে টগবগ করে ফোটে, এই তরল মোম সেই মাত্রায় উত্তাপ অনেক, অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে। তরল মোমে কাপ ভরে উঠলে কাত হয়ে যাবে, জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়বে ওর গায়ে। সকালের মধ্যে ওর গোটা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, মোমের নিচে ঢাকা পড়ে যাবে।'

'ও মারা যাবে ধীরে ধীরে,' অপর মেয়েটা বলল। 'শুনতে হয়তো আপনার খারাপ লাগছে, তবে বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা ঘৃণা নেই। এ আমাদের নিয়তির নিয়ন্ত্রণ ও আত্মার সন্তুষ্টির জন্যে বলি দেয়া মাত্র। যারা সুস্থ ও রোগমুক্ত তারা শুভ, সুন্দর, প্রেম ও শান্তির প্রতীককে পুজো করে, উপাসনা করে, তারই কাছে নাজাত চায় বা প্রার্থনা করে। কিন্তু আমরা, যাদের জখম মেরামতের অযোগ্য, আমরা বলি দিই শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে—কারণ শয়তানই তো আমাদের নিয়তির নিয়ন্ত্রক।'

grohon.com

এরপর তারা মোমবাতিগুলো ধরাল। একটা মিছিল আসতে দেখল রানা, নেতৃত্ব দিচ্ছে চশমা পরা অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর ইয়াকোমো। ধীরগতিতে এল মিছিলটা, সবাই নিচু গলায় গান গাইছে বা শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মন্ত্র পড়ছে। মিছিলে যোগ দিল মেয়ে দুটো। সবাই তারা বেদির উদ্দেশে মেঝেতে কপাল ঠেকাল। তারপর একজন করে দাঁড়াল, হেঁটে এসে হাত বোলাল ইভার নগ্ন শরীরে, মন্ত্র পড়তে পড়তে ফিরে গেল মন্দিরের বাইরে।

একজন করে গায়ে হাত দেয়, অমনি চেঁচিয়ে ওঠে ইভা। ব্যথা নয়, ভয় তাকে অসুস্থ করে তুলছে।

এত কিছুর মধ্যে রানা লক্ষ করল মেটাল কাপগুলো ধীরে ধীরে তরল উত্তপ্ত মোমে ভরে উঠছে।

কব্জি আর গোড়ালি বাঁধা রশি পরীক্ষা করে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা, ছেঁড়া বা ঢিল করা সম্ভব নয়। ছুরিটা আছে, কিন্তু কোন কাজে লাগবে না। অথচ মুক্ত হবার কোন ব্যবস্থা করা না গেলে ওর চোখের সামনে মারা যাবে ইভা। আর ইভার পরই আসবে ওর পালা।

গুহা ছেড়ে চলে গেল সবাই। মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল ইভা, চোখ দুটো আবার পানিতে ভরে উঠেছে। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে তার হাত দুটোর দিকে তাকাল রানা। ওগুলো কব্জির নিচ থেকে আঙুল পর্যন্ত মুক্ত, নাগালের মধ্যে পেলে কিছু ধরতে পারবে ইভা।

মেঝেতে ঘষা খেয়ে বেদির দিকে এগোল রানা। পাথরটার ধারে পৌঁছে দম নেয়ার জন্যে থামতে হলো। পেশি টনটন করছে ব্যথায়, ঘনঘন ওঠা-নামা করছে বুক। দু'মিনিট বিশ্রাম নিয়ে অতি কষ্টে সিধে হলো। গোড়ালি এক হয়ে থাকায় টলমল করছে শরীর। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ইভার নগ্ন শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়তে হলো। তার ডান স্তনে চেপে বসল মাথা। অন্য কোন

পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা রানা সম্ভবত উপভোগই করত। বেদির কিনারা ধরে সরে এল ও, একদিক থেকে আরেকদিকে। ওর মাথা এখন ইভার উরুতে। 'মন দিয়ে শুনুন,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'আমি ঘুরছি। আমার হাতে, কনুইয়ের ওপর, একটা ছুরি থাকবে। ওটা আমি আপনার হাতে ধরিয়ে দেব। ওটা আপনি এমনভাবে ধরবেন, ডগাটা যেন ওপরদিকে থাকে। তারপর আমার হাতের রশি কাটবেন। পারবেন তো?'

ইভা মাথা ঝাঁকাল। ঘুরল রানা, সিধে থেকে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো। বেদির কিনারায় হাতের ওপরের অংশ চাপ দিয়ে ঘষে ছুরিটা খাপ থেকে খসাল, আঙুলের ফাঁকে আটকাল, তারপর তুলে দিল ইভার খোলা হাতে।

হাতলটা কায়দা মতই ধরল ইভা। ফলার গায়ে কব্জিতে বাঁধা রশি ঘষছে রানা। কাজটা মাত্র শুরু হয়েছে, এই সময় অকস্মাৎ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ইভার গলা থেকে, হাতটা আবার খুলে যেতে আঙুল থেকে ছুরিটা খসে পড়ল মেঝেতে।

ভারসাম্য হারিয়ে রানাও আছাড় খেয়ে পড়ল। চোখে না দেখেও বুঝতে পারছে কি ঘটেছে, কেন এখনও চিৎকার করছে ইভা। উত্তপ্ত ও তরল মোমের প্রথম বর্ষণটা তার তলপেটে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

চিৎকারের বদলে ইভা এখন ফোঁপাচ্ছে। ইয়াকোমো আর তার সঙ্গীরা জানে কেন সে চিৎকার করেছে, কাজেই মজা দেখার জন্যে তাদের ছুটে আসার কথা। কে বলবে কেন এখনও আসছে না।

শোয়া অবস্থায় রানা দেখতে পাচ্ছে আরেকটা মেটাল কাপ তরল মোমের ভারে একদিকে কাত হতে শুরু করল। দ্বিতীয় বর্ষণটা হলো প্রথমটার পাশে, পাঁজরগুলোর কিনারায়। আবার চিৎকার করল ইভা। এই অবস্থায় ছুরিটা তুলে ইভার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। যা করার নিজেকেই করতে হবে।

grohon.com

বেদির আরেক মাথায়, ইভার পায়ের কাছে, নিঃসঙ্গ একটা মোমবাতি জ্বলছে লম্বা একটা হোল্ডারের ওপর। কয়েকটা গড়ান দিয়ে হোল্ডারটা ফেলে দিল রানা। ভাগ্য ভাল মোমবাতিটা হোল্ডারেই থাকল, নিভলও না-শোয়া অবস্থায় জ্বলছে। ওটার দিকে পিছন ফিরে বসল রানা। বাঁধা হাত দুটো একটু একটু করে শিখার ওপর নিয়ে এল।

লোম ও চামড়া পুড়ছে। হাত সরিয়ে আনল রানা, একটু পর আবার শিখার ওপর ধরল রশিটা।

নিজেকে রানা এভাবে পোড়াচ্ছে দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ইভা, এখন আর ফোঁপাচ্ছেও না। চামড়া পুড়ল, তবে তার সঙ্গে রশিটাও পুড়ল। তিন মিনিটের মধ্যে বাঁধন মুক্ত হলো রানা। গুহার ভেতরটা কটু গন্ধে ভরে গেছে। জ্বালা-পোড়া গ্রাহ্য না করে মেঝে থেকে ছুরিটা তুলে পায়ের বাঁধন কাটল রানা, তারপর স্ট্র্যাপ কেটে মুক্ত করল ইভাকে।

বেদির পাশে রানাকে জড়িয়ে ধরল ইভা, তার খালি পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেল্ট বাকল-এর পিছনে আঙুল ঢোকাল রানা, খুদে প্যানেল সরিয়ে বের করে আনল ছোট্ট একটা সেন্ডিং ইউনিট। 'অপারেশন জি-ই,' মেসেজ পাঠাল। 'অপারেশন জি-ই।' তিনবার কল লেটার উচ্চারণ করার পর গানফায়ার চাইল রানা। দ্বীপটার পজিশন ও বর্ণনা জানিয়ে নির্দেশ দিল মন্দিরটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। চীনা ইন্টেলিজেন্স-এর ঝাং ঝিয়াং ওকে জানিয়েছে, ওদের চারটে এস.ও.আই. ক্লাস সাব চেজার কুরিলের কাছাকাছি জলসীমায় তৈরি হয়েই থাকবে। প্রতিটি সাব চেজারে চারটে করে 55mm কামান আছে, আরও আছে চারটে করে ফাইভ ব্যারেল রকেট লঞ্চার। পাওয়ার প্যাক যদি নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে থাকে, ওর নির্দেশ ঝাং ঝিয়াং ঠিকই শুনতে পেয়েছে।

মেসেজ পাঠানো শেষ হতেই চারজন লোককে নিয়ে গুহার অন্ধকার প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল খর্বকায় প্রফেসর। দূর থেকে ইভাকে রানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঢোলা ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাল সে। গুলির আওয়াজ চিনতে পারল রানা, ওটা ওরই ল্যুগার। ইভাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে নিজেও ডাইভ দিল ও। আরেকটা গুলি করল ইয়াকোমো। রানার দিকে ছুটে আসছে সে। গড়িয়ে বেদির আড়ালে চলে এল রানা, উঁকি দিয়ে দেখল ইয়াকোমোর তিন সঙ্গীর হাতে ছোরা, তারা ধীর পায়ে সাবধানে এগোচ্ছে।

বেদির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ইয়াকোমো, তার একজন সঙ্গী বেদির উল্টোদিক ধরে ঘুরে এগোচ্ছে–দু'জন মিলে ঘিরে ফেলতে চাইছে রানাকে।

বেদি ঘুরে লোকটাকে আসতে দেখল রানা। আওতার মধ্যে হোল্ডার সহ মোমবাতিটা রয়েছে, ছোঁ দিয়ে তুলে ছুঁড়ে মারল রানা মোমবাতিটা। তরল মোম ভিজিয়ে ও পুড়িয়ে দিল লোকটার চোখমুখ, আর্তচিৎকার করে পিছু হটল সে।

বেদিতে চড়ছে ইয়াকোমো। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। তার মাথার ওপর ঝুলছে সারি সারি মোমবাতি আর ওগুলোর নিচে লম্বা মেটাল কাপ। হাতের হোল্ডারটা তার মাথার ওপরের মোমবাতি লক্ষ্য করে ছুঁড়ল রানা। কোথায় লাগল বলতে পারবে না, কাপগুলো ঝাঁকি খেতে দেখল, জলপ্রপাতের মত নেমে এল আগুনের মত গরম মোম। গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, কানে বাজছে ইয়াকোমোর চিৎকার। সিধে হয়েই ছুরিটা ছুঁড়ল রানা। ডান চোখের ঠিক ওপরে, কপালে বিঁধল ফলা–হাতলটুকু বাদে। পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর. মেটাল কাপ থেকে এখনও তার গায়ে মোম ঝরছে। ছুটে এসে ছুরিটা খুলে নিল রানা। ল্যুগারটা বেদির ওপরই পাওয়া গেল। ইভার চিৎকার শুনে ফাঁকা দুটো গুলি করল ও। তাকে ছেড়ে দিয়ে

grohon.com

খিচে দৌড় দিল অশুভ চক্রান্তের দুই পোকায় খাওয়া শিকার। এলো চুল, দু'হাত সামনে বাড়ানো, কাঁদতে কাঁদতে রানার দিকে ছুটে এল ইভা।

কয়েকটা দরজা দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকতে চাইছে সন্ন্যাসীরা। খানিকটা ঢুকতে দিল রানা, তারপর দুটো গুলি করল। পাক খেয়ে পঙ্গপালের মত যে যেভাবে পারল বেরিয়ে গেল ওরা গুহা থেকে। ইভার হাত ধরে টেনে একপাশে সরে আসছে ও, পেট্রল বোটের প্রথম শেলটা বিস্ফোরিত হলো। প্রাচীন মন্দির থরথর করে কেঁপে উঠল।

এরপর ঘন ঘন শেল পড়তে লাগল। কিছু শেল গাছপালার ভেতর পড়ল, কিছু সরাসরি মন্দিরে আঘাত করল। টার্গেট প্র্যাকটিসে ক্রমশ ভাল করছে চীনা গানাররা।

পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ কিছু লোক সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে পালাবার জন্যে দিগ্বিদিক ছুটছে। তবে তাদের সংখ্যা বেশি নয়। বাকি সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে—সম্ভবত বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্যে ওদের নিয়তির নিয়ন্ত্রক শয়তানকে ডাকছে। ওদের জন্যে দুঃখ ও মায়াই হলো রানার। ভুল পরামর্শে কান দিয়েছে ঠিকই, স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিও খুইয়ে বসেছে, কিন্তু এ-ও বিবেচনা করতে হবে—কোন্ পরিস্থিতিতে ওদের এই পরিবর্তন। যারা ওর গলার নাগালের মধ্যে আছে তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সৈকতে চলে যাও—কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।'

গুহার অন্ধকার প্রান্তে একটা শেল বিস্ফোরিত হলো। ইভাকে নিয়ে সেদিকে ছুটল রানা। সদ্য ভাঙা দেয়াল টপকে মন্দির থেকে বেরুতেই পুবদিকের আকাশ দেখতে পেল। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। বুঝতেই পারল না এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল কিভাবে।

বাইরে এসে বোঝা গেল চীনা গানাররা কতটুকু সফল।

খানিক পর পর সন্ন্যাসীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখল ওরা। মন্দিরের আশপাশের বেশিরভাগ ঘরই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

এক খণ্ড গেরুয়া কাপড় যোগাড় করল রানা। লাশের গা থেকে খোলা হলেও, গায়ে চড়াতে আপত্তি করল না ইভা।

যেভাবে শেল এসে পড়ছে, ফাঁকা জায়গায় থাকা বিপজ্জনক। কয়েকটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা। পাওয়ার প্যাক বের করে আরও একটা মেসেজ পাঠাল রানা: *ফায়ার বন্ধ করো। সৈকত থেকে তুলে নাও আমাদের।*

সাত

সৈকত থেকে ছোট একটা বোটে চড়ে পেট্রল ক্রুজারে পৌছল ওরা। শেল নিক্ষেপ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ ছিল, রানা ও ইভা বোটে চড়ার পর শুরু হয়েছে আবার। এবার শুধু শেল নয়, মিসাইলও ছোঁড়া হচ্ছে।

পেট্রল ক্রুজারে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপটেন চু চা চ্যাঙ। প্রথমেই ডেকের নিচে পাঠিয়ে দেয়া হলো ইভাকে। সেখানে তাকে ভদ্রগোছের পরিচ্ছদ আর ব্র্যান্ডি মেশানো কফি দেয়া হলো।

পথ দেখিয়ে রানাকে রেডিওরুমে নিয়ে এল ক্যাপটেন। প্রথমে ডব্লিউ ক্লাস চীনা সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, তারপর 'অপারেশন গ্লোবাল ইমার্জেন্সি'র জন্যে নির্ধারিত বিশেষ একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে মেসেজ পাঠাল: ড. ডিউইটকে নিয়ে অন্য জায়গায় সরে গেছে কবীর চৌধুরী, ভাইরাস X-99 উদ্ধার করা

grohon.com

সম্ভব হয়নি।

ঝাং ঝিয়াং-এর গলা পেল রানা। তারপর রেডিও কনট্যাক্ট কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখা হলো। আবার যখন যোগাযোগ হলো, চাইনিজ ইন্টেলিজেন্স চীফ কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানালেন রানাকে, সেগুলো দ্রুত পালাক্রমে রাহাত খান, জন স্যান্ডফোর্ড, ভ্লাদিমির বেনিন ও তানাকা তাকাওশিকে দিয়ে অ্যাকনলেজ করিয়ে নেয়া হলো। জাপানের সমুদ্রসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে, চীনা হেলিকপ্টার সেখানে পৌঁছে দেবে রানা আর ইভাকে। ইতিমধ্যে একটা রিপোর্ট তৈরি করবে রানা, ক্যারিয়ারের শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হবে সিআইএ চীফ ও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে।

সব শেষে আবার ঝাং ঝিয়াঙের সঙ্গে কথা হলো। ঝিয়াং একটু তিক্ত সুরেই বলল, 'তোমার এত নাম, এরচেয়ে ভাল কিছু আশা করেছিলাম, দোস্ত!'

রানা জবাব দিল, 'আমার জায়গায় তুমি আসতে চাও?'

বোতাম টিপে যোগাযোগ কেটে দিল ঝিয়াং।

পেট্রল ক্রুজারের একটা কেবিনে বসে ইভাকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। নাবিকের শার্ট ও ট্রাউজার পরার আগে শাওয়ার সেরে মাথায় চিরুনি চালিয়েছে মেয়েটা। কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, 'আ[illegible]র প্রতি আমি চিরঋণী হয়ে থাকলাম, রানা।'

হেসে ফেলল রানা, বলল, 'আপনাকে আমি ঋণ শোধ করার একটা সুযোগ দিচ্ছি। চিন্তা করে দেখুন আপনার মামা, কবীর চৌধুরী বা কিয়াংশি নিজেদের মধ্যে কোথাও যাওয়া নিয়ে আলোচনা করেছিল কি না। হেলিকপ্টার নিয়ে গেছে, তারমানে খুব দূরে কোথাও যায়নি।'

'মামা তো মন্দিরে গিয়েছিল শুধু ওখানে আমাকে রেখে আসতে,' বলল ইভা। 'ভাইরাসটা মন্দিরে আনাই হয়নি।'

'কোথায় রেখে এসেছে আপনি জানেন?'

মাথা নাড়ল ইভা। 'কুরিলে যাবার সময় নিজেদের মধ্যে ওরা নিচু গলায় কথা বলছিল, তেমন কিছুই আমি শুনতে পাইনি। শুধু বুঝলাম অপারেশনের চূড়ান্ত পর্বে একজন জেট পাইলট যোগ দেবে। ওই পাইলটের স্ত্রী এক রেডিওঅ্যাকটিভ এক্সপ্লোশনে মারা গেছে।'

রানা চিন্তামগ্ন হলো। জেট পাইলটের অর্থ হতে পারে লং রেঞ্জ।

'আরেকটা কথা,' রানার মনোযোগ দাবি করল ইভা। 'কিয়াংশিকে আমি কথাটা বলতে শুনেছি।'

'কি কথা?'

'তিন মাথা।'

'তিন মাথা মানে?'

'কিয়াংশি কবীর চৌধুরীকে বলছিল, পাইলট ওদের সঙ্গে মিলিত হবে তিন মাথায়। ইংরেজিতে বলছিল–"দ্য টিপ অভ দ্য থ্রী"।'

এই সময় একজন নাবিক এসে জানাল পেট্রল ক্রুজার একটা ডেস্ট্রয়ারের পাশে ভিড়েছে। ডেস্ট্রয়ারে হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, ওদেরকে পৌঁছে দেবে ইউএস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে।

চার ঘণ্টা পর ক্যারিয়ার থেকে সরাসরি সিআইএ চীফ জন স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে কথা বলল রানা। ওর বক্তব্য শেষ হতে অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'ডিউইট সবাইকে পুতুল বলে গাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত কবীর চৌধুরীর খেলনায় পরিণত হলেন? এবং আপনি বলছেন, নিজের পৈত্রিক প্রাণটিও তিনি রক্ষা করতে পারবেন না?' রানার দেয়া কয়েকটা তথ্য টুকে নিলেন, তারপর বললেন, 'এদিকে আমরা কাজ শুরু করছি, আপনি তৈরি থাকুন। ভাল কথা, মেয়েটার ওপর খেয়াল রাখুন, তার হয়তো আরও কিছু মনে পড়বে।'

grohon.com

কিন্তু ইভা আর কিছু মনে করতে পারল না। আড়াই ঘণ্টা পর ক্যারিয়ারের রেডিওরূমে ডাক পড়ল রানার। মাথায় হেডফোন পরতেই সিআইএ চীফের গলা পেল ও। 'কয়েকটা লিঙ্ক জোড়া লাগানো গেছে, আপনার কাজে লাগতে পারে। ভ্লাদিমির বেনিন বলছেন, জেট পাইলট তাদের লোক হতে পারে। তাঁকে এমন কিছু ঘটনার কথা স্বীকার করতে হয়েছে, যা রাশিয়ার জন্যে বিব্রতকর–আমাদের অতীত রিপোর্টের সত্যতাও প্রমাণ করে। এক, কিছুদিন আগে নতুন এক ধরনের ওঅরহেড পরীক্ষা করতে গিয়ে খুব খারাপ ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে রাশিয়ায়। একটা মেয়ে মারা যায়। তার স্বামী একজন জেট পাইলট, নাম মিখাইল লুদভিক। বেনিন এ-ও স্বীকার করেছেন যে তাঁদের একটা লং রেঞ্জ জেট এক হপ্তা ধরে নিখোঁজ, পাইলট লুদভিক সহ।'

'কিন্তু এ-সব থেকেও জানা যাচ্ছে না কবীর চৌধুরীকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'আমি হয়তো জানি কোথায় তাকে পাওয়া যাবে,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'ওই শব্দটা, মি. রানা–তিন মাথা। আমাদের ক্রিপটোগ্রাফি এক্সপার্টরা হেঁয়ালিটার সম্ভাব্য একটা সমাধান দিয়েছে। একটা স্পট আছে, কুরিল থেকে বেশি দূরে নয়–যেখানে রাশিয়া, চীন আর কোরিয়া মিলিত হয়েছে। হেলিকপ্টার নিয়ে পৌছানো যায়। তিনটে দেশ চাঙকুফেং নামে একটা জায়গাকে স্পর্শ করেছে।'

রানা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। আল্লাহই জানে দেরি হয়ে গেছে কি না।'

'আপনার সাফল্য কামনা করি, রানা। সাধ্যমত করুন। দু'জন বাছাই করা লোক নিয়ে বেনিন আগেই রওনা হয়ে গেছেন। মি. ঝিয়াংও পৌছাবেন। বেনিনকে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন মনে হলো।

সেজন্যে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন কবীর চৌধুরী প্রেসিডেন্ট পুতিনকে খুন করার জন্যে ভাইরাসটা ব্যবহার করবে। তিনি চাইছেন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে শেডিউলের আগেই প্রেসিডেন্ট পুতিন মস্কো ত্যাগ করুন।'

'ওহ্, গড!'

'হ্যাঁ, আপনার মত আমিও কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছি। কবীর চৌধুরী হয়তো এটাই চাইছে, মি. রানা। একা প্রেসিডেন্ট পুতিনকে হত্যা করার প্ল্যান থাকুক বা না থাকুক, আমার ধারণা টার্গেট হিসেবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সবাইকে এক জায়গায় পেতে চাইছে সে।'

'জাতিসংঘকে গোলটেবিল বৈঠক বাতিল করতে বলা যায় না?'

'যায়, কিন্তু বললেই কি দুনিয়ার মাথারা শুনবেন? উন্মাদ এক খুনীর ভয়ে সবাইকে ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে, শুনতেও তো ভাল লাগে না, বলুন?'

'আপনাদের এই ক্যারিয়ারে ভিজিল্যান্টি এ-ফাইভ আছে, আমার দরকার হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, এখুনি ওদেরকে বলে দিচ্ছি আমি। একটা কথা, মি. রানা।'

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'আপনি কি নিশ্চিত, ইয়াকোমো কবীর চৌধুরীর প্রতিনিধি হিসেবে, তার নির্দেশে খুন করতে যাচ্ছিল মেয়েটাকে?'

'যতটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।'

'এমন কি হতে পারে না যে ডিউইট এখনও বেঁচে আছেন?' প্রশ্ন তুললেন স্যান্ডফোর্ড।

কৌতুক, সেই সঙ্গে খানিকটা বিদ্রূপ করার সুযোগ ছাড়ল না রানা। 'ভিলেন বাংলাদেশী না হয়ে আমেরিকান হলে আপনি কি

খুশি হন, মি. স্যান্ডফোর্ড?'

সিআইএ চীফও কম যান না। 'পৃথিবীকে প্রাণীশূন্য করা হবে, এরচেয়ে বড় ঘটনা আর কিছু হতে পারে না, মি. রানা। খারাপ ভাল যাই বলুন, সবধরনের বড় কাজেরই কর্তা হবার খুব শখ আমেরিকানদের।'

কাজের কথায় ফিরে এল রানা। 'আমার বিশ্বাস ডিউইট বেঁচে নেই। তবে ইভাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। তার জেদ, সে যাবেই।'

'আমিও চাই ওকে আপনি নিয়ে যান।'

ভিজিল্যান্টির দুই সীটের একটায় কষ্টেসৃষ্টে ইভাকে নিয়ে বসল রানা, বাকি সীটে ওদের পাইলট। ক্যারিয়ার থেকে এক জোড়া জিন্স আর চেইন লাগানো একটা জ্যাকেট দেয়া হয়েছিল, কিভাবে যেন ফিট করে গেছে ইভাকে। এক সীটে দু'জন, তারপর প্যারাসুট প্যাকের বোঝা বহন করতে হচ্ছে, বসাটা মোটেও আরামদায়ক হলো না। জোড়া জে সেভেন নাইন টারবো জেট প্লেনটাকে ঘণ্টায় এক হাজার চারশো মাইল গতিতে দৌড় খাটাতে পারে। এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর দেখা গেল কোরিয়া উপকূলে সোসুরা-র ওপর চলে এসেছে ওরা। তারপর ওই ভূখণ্ডের প্রান্তসীমায়, যেখানে তিনটে রাষ্ট্র এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। মাঞ্চুরিয়ান সীমান্তের কাছে গ্রামটা দেখতে পেল ওরা–চাঙকুফেং। চাঙকুফেং-এর সামনেই রুশ সীমান্ত, সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম পডগরনায়া। চাঙকুফেংকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল প্লেন। মাটির বাড়িঘর, টিনের ফার্মহাউস, পাহাড়ী এলাকা, কিছু গাছপালা, ব্যস, আর কিছু দেখার নেই। জেট ল্যান্ড করার মত ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল না।

জমিন এখানে একটা আঙুলের মত, আঙুলের মাথায় তিন দেশ এক হয়েছে। হাত বাড়িয়ে নিচটা রানাকে দেখাল পাইলট।

মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বাড়ি, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্লেনের উদ্দেশে হাত নাড়ছে এক লোক। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ভ্লাদিমির বেনিনকে চিনতে পারল রানা। রুশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হাত নাড়ছে না, হাতের রাইফেলটা নাড়ছে। রানা যেমন আশা করেছিল, ওদের আগেই পৌঁছে গেছে বেনিন। কতটুকু কি জানতে পেরেছে সেগুলো শেয়ার করবে কি না, নানা প্রশ্ন জাগছে রানার মনে।

আকাশের আরও অনেক ওপর প্লেন তুলে ইজেক্টর বাটনে চাপ দিল পাইলট। ধাক্কা দিয়ে ওপরে ছুঁড়ে মারার অনুভূতি হলো রানার, তারপরই খসে পড়তে শুরু করল। পতনের গতি কমে গেল প্যারাসুট খোলার পর। আকাশের গায়ে গোল একটা ছাতার মত দেখাল খোলা প্যারাসুট সহ ইভাকে।

ফার্মহাউস থেকে দুশো গজ দূরে নামল রানা। প্যারাসুট খুলে ইভার দিকে ছুটল সাহায্য করতে। পৌঁছবার আগেই উত্তর আকাশ থেকে সগর্জনে উড়ে এল তিনটে চীনা জেট ফাইটার। ডানা উঁচু-নিচু করল ওগুলো, তারপর আরও ওপরের আকাশে উঠে গেল। ওগুলোর একটায় নিশ্চয়ই ঝাং ঝিয়াং আছে, আন্দাজ করল রানা।

ইভাকে নিয়ে ফার্মহাউসের দিকে এগোল রানা। বেনিন বাড়ির ভেতর ফিরে গেছে। ভেতরে ঢুকে কামরার চারদিকে চোখ বোলাল ও, মেঝেতে শুয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা দু'জন রুশকে পাশ কাটাল। সরু একটা বিছানা, তাতে পড়ে আছেন ড. ক্লিনটন ডিউইট। বেশ গভীর ও লাল একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে তাঁর কপালে। ইভার আঁতকে ওঠার শব্দ পেল রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে বিছানার দিকে ছুটল।

ঘরটার দেয়াল মাটির, ওপরে টিন। এখান থেকে আরও দুটো ঘরে যাওয়া যায়। ইঙ্গিতে ডিউইটকে দেখাল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি মারা গেছেন?'

বেনিন প্রায় অলস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'এখনও অন্তত নয়।

grohon.com

grohon.com

তবে একটা বুলেট কপাল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। উনি এখন কোমায় আছেন, রানা। দেখতেই পাচ্ছ, এখানে একটা যুদ্ধ হয়েছে। বাড়িটা খুঁজে পাবার পর অ্যাটাক করি আমরা।'

রানা কিছু বলছে না।

ইঙ্গিতে সৈনিকদের লাশ দুটো দেখাল বেনিন, একটা লাশের পাশে ফিল্ড ট্র্যান্সমিটার পড়ে রয়েছে। 'আমার দু'জন লোক খুন হয়েছে,' ক্ষোভ প্রকাশের সুরে বলল। 'আমি পাশের কামরা থেকে পাল্টা হামলা করি। ডিউইটকে একটা গুলি লাগাতেই বাকি সবাই লেজ তুলে পালিয়ে গেল।'

'বাকি সবাই মানে? ডিউইটের সঙ্গে আর কারা ছিল?'

'সুমো কুস্তিগির কিয়াংশি আর জেট পাইলট,' বলল বেনিন। 'আরও দু'জন ছিল, ভাল করে দেখতে পাইনি। তারা একটা ল্যান্ডরোভারে ছিল।'

'জেট পাইলট ছিল? কিন্তু তার জেট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটা সম্ভবত ইনল্যান্ডের কয়েক মাইল ভেতর দিকে কোথাও কোন সমতল জায়গায় লুকানো থাকার কথা। সে যাই হোক, আমাদের জরুরী সমস্যার অন্তত সমাধান হয়েছে।'

বেনিনের চোখে এমন কিছু আছে, রানা পড়তে পারছে না। কোন অজ্ঞাত কারণে সে যেন উল্লাস অনুভব করছে। ব্যাপারটা ওর পছন্দ হলো না, তবে ধরে নিল সবার আগে পৌঁছে ডিউইটকে কাবু করতে পেরেই উল্লাস অনুভব করছে সে। 'কেন বলছ আমাদের জরুরী সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?' শান্ত গলায় জানতে চাইল ও।

ইঙ্গিতে নিথর পড়ে থাকা ডিউইটকে দেখাল বেনিন। 'যত নষ্টের গোড়া তো এই ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট, তাই না? তাকে আমরা অচল করে দিয়েছি। এ-ধরনের জখম আগেও আমি দেখেছি—কয়েকমাস বেঁচে থাকে, কিন্তু কোমায়, পঙ্গু হয়ে। যে প্ল্যানই করে থাকুক, সব ভেস্তে গেছে। এখন শুধু একটা কাজ

বাকি আমাদের। এক প্লাটুন সৈন্য দিয়ে গোটা এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করানো। ভাইরাসটা উদ্ধার করা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'আমরা যে বিপদে পড়েছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'তার জনক কিন্তু ডিউইট নন, বেনিন। নষ্টের গোড়া যদি কাউকে বলতে হয় তো সে হলো কবীর চৌধুরী। তাকে নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই দেখে আমি অবাক হচ্ছি।'

বেনিন কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল চীনা ইন্টেলিজেন্স। ঝাং ঝিয়াং-এর সঙ্গে তিনজন সহকারী। চারদিকে চোখ বুলিয়ে যা বোঝার বুঝে নিল ঝিয়াং। সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা তাকেও আরেকবার ব্যাখ্যা করে শোনাল বেনিন। সব শুনে ঝিয়াং বলল, 'বেনিনের সঙ্গে আমি একমত। আসল বিপদটা কেটে গেছে। কবীর চৌধুরী? পালিয়ে সে যাবেটা কোথায়, বেনিন তাকে ঠিকই পাকড়াও করবে।'

'তোমাদের আত্মবিশ্বাস দেখে আমার উৎসাহিত হওয়া উচিত, কিন্তু হতে পারছি না–দুঃখিত,' বলল রানা। 'আসল বিপদ ভাইরাসটা, সেটাই এখনও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। আমরা এমনকি এ-ও জানি না যে ভাইরাসটা এখানেই কোথাও আছে কি না।'

'ওটা এখানেই আছে, এবং আমরা সেটা অবশ্যই খুঁজে বের করব, এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, রানা,' জোর দিয়ে বলল বেনিন। ঝিয়াং-এর দিকে ফিরল সে। 'তুমি কি সার্চে অংশগ্রহণ করতে চাও?'

'তোমাদের দক্ষতার ব্যাপারে আমার আস্থা আছে,' বলল ঝিয়াং। 'আমি মনে করি সহযোগিতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এখন আমাকে নিজের কাজে ফিরে যেতে হবে।'

রানা বলল, 'ড. ডিউইটকে আমি আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তাররা হয়তো তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তখন

grohon.com

জেরা করলে জানা যাবে ভাইরাসটা কোথায় লুকানো হয়েছে এবং কবীর চৌধুরীর প্ল্যানটা আসলে কি।'

হেসে উঠে বেনিন বলল, 'স্রেফ পণ্ডশ্রম, রানা। ভাইরাসটা আমার লোকজনই খুঁজে বের করতে পারবে।'

ঝিয়াং-এর দিকে ফিরে রানা বলল, 'ডিউইটকে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে সাহায্য লাগবে আমার।'

'সাহায্য করার লোক এখানে অনেক পাবে তুমি,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ঝিয়াং, বোধহয় কৌতুক করার জন্যেই স্যালুট করল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেঝেতে পড়ে থাকা রেডিও ট্র্যান্সমিটারের দিকে বেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'ওটা আমি ব্যবহার করতে চাই।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে হাসল বেনিন। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি নিজেও মি. স্যান্ডফোর্ডের সাথে কথা বলব।' ট্র্যান্সমিটারটা তুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

আগেই একটা কোড ঠিক করা হয়েছে, সেটা ব্যবহার করে ক্যারিয়ার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, ওর নির্দেশ মত লাইনের সঙ্গে সিআইএ হেডকোয়ার্টারের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া হলো। স্যান্ডফোর্ডকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা, সবশেষে বলল, 'বেনিন কি বলে তাও শুনুন।'

বিপদ কেটে গেছে, এই ধারণার পিছনে নিজের যুক্তি ব্যাখ্যা করল বেনিন, তারপর সেটটা আবার ফিরিয়ে দিল রানাকে।

স্যান্ডফোর্ড ওকে বললেন, 'আপনার বক্তব্য আমি হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন আর জাতিসংঘ সদর দফতরকে জানাচ্ছি, মি. রানা। এটা স্রেফ একটা ফরমালিটি, ওদের সিদ্ধান্তের জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। মি. বেনিনের বক্তব্যও শুনলাম–এই পর্যায়ে এ-ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করব না। তবে ওঁরাই যেহেতু আপনাকে ওঁদের লীডার বানিয়েছেন, বিশেষ করে নিজের ভোটটাও বেনিন আপনাকে দিয়েছেন, এখন এটাই

তো স্বাভাবিক যে আপনার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে সবাইকে। মি. ঝিয়াং কেন নিজেকে এভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন, আমি বুঝতে অক্ষম। মি. রানা, আপনার যেটা ভাল মনে হয় সেটাই করুন।'

রানা বলল, 'আমার ধারণা কবীর চৌধুরী একটা নাটক করেছে। সবাইকে বুঝতে দিয়েছে ভাইরাসটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে কুরিলে, কিন্তু আসলে জিনিসটা সে সঙ্গে করে এদিকে আনেইনি। ওটা আমেরিকাতেই আছে, এবং ডিউইটকে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে এখন আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে।'

'মি. বেনিন আপনার সঙ্গে একমত নন, তবে আমি একমত,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'আই উইশ ইউ লাক, মি. রানা।'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে বেনিনকে রানা বলল, 'আমি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি। ডিউইটকেও নিয়ে যাব। এ-ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

বেনিনের মুখের হাসিটা স্থির হয়ে থাকল। রানা জানে, অন্য কোন পরিস্থিতি হলে বেনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, গো টু হেল। আবার সন্দেহ হলো ওর, গোপন কি একটা কারণে সে যেন উল্লাস বোধ করছে। সেটা সে চেপে রাখতে সফল হলেও, বেঈমানী করছে শুধু চোখ দুটো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই–বিপদের সময় বন্ধুকে বন্ধু সাহায্য করবে না তো কখন করবে।'

'আমার বিপদ তোমার বিপদ, এরকম ভাগ করার সুযোগ কি এই অ্যাসাইনমেন্টে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরে দূর, ওটা তো একটা কথার কথা, এমনি ঠাট্টা করছিলাম।' হেসে উঠল বেনিন। 'বড় প্লেন ওঠানামা করতে পারে এরকম সবচেয়ে কাছের এয়ারপোর্ট গায়াঙ্কা। আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছি, ওখানে তোমাদের জন্যে একটা প্লেন অপেক্ষা করবে। পাইলট তোমাদেরকে জাপানে পৌঁছে দেবে, ঠিক আছে? মেজর তাকাওশির সঙ্গে যোগাযোগ করে এই আয়োজনের কথা

grohon.com

জানিয়ে দিচ্ছি আমি।'

ট্রান্সমিটার অন করে নিজের লোকদের দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল বেনিন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও কৃত্রিম হাসি অর্থাৎ মুখোশটা খসে পড়ল চেহারা থেকে, কাজ আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ও আপসহীন মনে হলো তাকে, নির্দেশ দিল কর্কশ মারমুখো ভঙ্গিতে। সবশেষে রানার দিকে ফিরল। 'আমার জন্যে একটা গাড়ি আসছে,' বলল সে, স্থির হাসি আবার দখল করে নিয়েছে মুখ। 'তোমাদের জন্যেও একটা মিলিটারি লরি আসছে। এখানেই অপেক্ষা করো তোমরা। তবে আবার বলছি, এ পণ্ডশ্রমের কোন মানে হয় না, রানা। ডিউইট কোনদিনই আর জ্ঞান ফিরে পাবে না। তার পাগলামি আর নির্বুদ্ধিতার অপমৃত্যু ঘটেছে। তার জীবনটাকে কেন তুমি এত মূল্যবান মনে করছ, বুঝতে পারছি না। একে আমি বোকামি ছাড়া আর কি বলতে পারি!'

রানা জানে, জায়গাটা তিন দেশের সীমান্ত সংলগ্ন হলেও, এলাকায় রুশ সেনাবাহিনীর শক্তিই বেশি। গায়ের জোরে সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করার ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে। বেনিন যদি সহযোগিতা না করে, এলাকা ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে ওদের জন্যে। এমনকি চাইলে ওদেরকে খুনও করতে পারে সে-এখানে বা পথে কোথাও। পরে ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে আশঙ্কাটা উড়িয়ে দিল রানা। তবে বেনিনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে মন সায় দিচ্ছে না। ওকে বোকা বলে খোঁচা মারলেও, সিদ্ধান্ত নিল গায়ে মাখবে না।

একটা চেয়ার যোগাড় করে বিছানার পাশে বসেছে ইভা, মামার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রুশ সৈনিকদের লাশ দুটো দরজার সামনে থেকে এক পাশে সরিয়ে রাখল রানা, বেনিন ওকে কোন সাহায্য করল না। একটু পরই ধুলো উড়িয়ে রাশিয়ান

আর্মির একটা স্টাফ কার আসতে দেখা গেল। কার থেকে নামল রাইফেলধারী চারজন রুশ সৈনিক। তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল বেনিন। 'তোমার প্লেন গায়াঙ্কা এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে, রানা। একসঙ্গে কাজ করে যে অভিজ্ঞতাটা হলো, সত্যি উপভোগ করেছি। আসলে, এতটা উপকৃত হব বলে আশা করিনি।'

নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, ঠিক কি বলতে চায় সে? হাসি মুখে, হাত নাড়তে নাড়তে, গাড়িতে উঠে পড়ল বেনিন। সে যেন কি একটা গোপন খেলায় বিজয়ী হয়েছে, অন্তত হাবভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে। রানা বিভ্রান্ত। এই আচরণের যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। কার রওনা হয়ে গেল। বেনিন পিছন ফিরে ওর দিকে একবার তাকালও না।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ভাঙা পাঁচিলের মাথায় রানার পাশে বসল ইভা। 'আপনার কি মনে হয়? সত্যি কথা বলবেন। মামা কি বাঁচবেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না। তবে বাঁচলে বোধহয় সবারই মস্ত উপকার হয়।'

আট

এক ঘণ্টা পার হলো, তারপর আরও একঘণ্টা। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রানা, পরিত্যক্ত ফার্মহাউস থেকে বিস্তৃত আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপর পড়ে আছে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে ওকে জোর করে থামাল ইভা, ঘাসের ওপর বসিয়ে

কোলের ওপর মাথা দিয়ে শোয়াল, মাথার চুলে বিলি কেটে দিল, বলল, 'এত অস্থির হলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন যে!'

আরও বিশ মিনিট পর এঞ্জিনের শব্দ পেল ওরা, দেখল ধুলোর একটা মেঘ রাস্তা ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

দাঁড়াল ওরা। ধুলোর মেঘ থেকে বেরিয়ে এসে ক্যানভাস ঢাকা রাশিয়ান আর্মির লরি ফার্মহাউসের সামনে ব্রেক করল। একজন রুশ ননকম আর একজন সোলজার নামল লরি থেকে। ননকম থেমে থেমে ইংরেজিতে দু'একটা কথা বলে ভ্যানের পিছন থেকে একটা স্ট্রেচার নামাল।

ডিউইটকে কট থেকে স্ট্রেচারে তুলে লরিতে আনার সময় ওদের সঙ্গে থাকল রানা। লরির মেঝেতে বোল্ট দিয়ে আটকানো হয়েছে সরু একটা বেড। সামনের দিকে একটা কেবিনেট দেখল রানা, ব্যান্ডেজ আর ওষুধ-পত্রের বোতলে ঠাসা–সন্দেহ নেই, লরিটাকে ফিল্ড অ্যামবুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বেডের সঙ্গে ডিউইটকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হলো, বেডের পাশে একটা বেঞ্চে বসল সৈনিক লোকটা। লরির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ইভা, নিরবে দেখছে সব, চোখে ভয়-ভয় ভাব ও উদ্বেগ।

'তুমি সামনে, ক্যাবে বসো,' তাকে বলল রানা। 'ওনার সঙ্গে আমি থাকছি।'

'ওরা মামার কোন...' শুরু করল ইভা। 'আপনার কি মনে হয়?'

রানা বলল, 'আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। তবে আমি কোন ঝুঁকিও নিতে চাই না।'

রওনা হতে সন্ধে হয়ে গেল। আঁকাবাঁকা রাস্তায় কাদা-পানি জমে আছে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থা। বিছানার সঙ্গে ডিউইটকে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধার কারণটা বোঝা গেল। ছোট একটা নদী পড়ল রাস্তার পাশে, একবার হারিয়ে যায় আবার ফিরে আসে। লরির বাইরে মাথা বের করলে সঙ্গী চাঁদটাকে আকাশের নিচের দিকে দেখতে

পাচ্ছে রানা, পিতলের থালার মত চকচকে আর প্রকাণ্ড। চাঁদের আলোয় গাঢ় রূপালি ফিতের মত লাগল নদীটাকে। রাস্তার আরেক দিকে গাছপালা আর সারি সারি পাহাড়।

কিছুক্ষণ পর পর ডিউইটকে পরীক্ষা করল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত, হৃৎস্পন্দনও স্বাভাবিক। বেঁচে আছেন, কিন্তু সচেতন নন। এই অবস্থা মাসের পর মাস চলতে পারে। মাথায় আঘাত পাওয়া এরকম রোগী আগেও দেখেছে ও।

বেঞ্চে বসে চোখ বুজল রানা, বিরতিহীন ঝাঁকি খেয়ে ছুটছে লরি। পঞ্চাশ মাইল এগিয়েছে ওরা, ষাট মাইলও হতে পারে, এই সময় রাতের অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে বিস্ফোরিত হলো একটা আলো। ফ্লেয়ারটা সরাসরি মাথার ওপর ফাটায় চারদিক বেগুনি আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অকস্মাৎ ব্রেক কষায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো লরি, সেই সঙ্গে একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। ঝট করে সৈনিকটার দিকে ফিরল রানা। তার চমকে ওঠা অকৃত্রিম, ছোঁ দিয়ে রাইফেলটা তুলে ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

মাটিতে শুধু পা দিয়েছে, রানা তাকে পাক খেয়ে নাচতে দেখল; পড়ে যাবার সুযোগই পাচ্ছে না, স্নাইপারদের বিশ-পঁচিশটা বুলেট যতক্ষণ পারল খাড়া করে রাখল তাকে।

একই জায়গা দিয়ে নিচে নামল রানা, তবে লাফ দিয়ে নয়, লরির গা থেকে পিছলে। নেমেই শুয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে টেনে নিল সৈনিকের রাইফেল। লরির তলা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে ক্যাবের নিচে, চাকার পাশে রুশ ননকম আর ইভাকেও রাস্তার ওপর শুয়ে থাকতে দেখল ও।

'পাহাড়ী দস্যু,' বলল ননকম।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দিকে তাকাতেই কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে কাভার নিতে দেখল রানা ছোটার সময় লরির দিকে গুলি করছে। ক্রল করে লরির

grohon.com

সামনে চলে গেল ননকম, এগিয়ে আসা কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল, পাল্টা গুলি হচ্ছে না দেখে সিধে হয়ে ছুটল বড় একটা ঝোপ লক্ষ্য করে। কিন্তু পৌঁছুতে পারল না। অটোমেটিক রাইফেলের এক পশলা বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তাকে।

বাঁ দিকের একটা ঝোপ থেকে আরও একটা ফ্লেয়ার আকাশে উঠল। এরকম আলো জ্বলতে থাকলে বাঁচার কোন আশাই নেই ওদের। দশটা ছায়ামূর্তি গুনল রানা, দু'চারজন আরও থাকতে পারে। ধীরে ধীরে, সাবধানে হলেও, এখনও তারা সামনে বাড়ছে।

ট্রাকের তলায় থাকো,' ইভাকে বলল রানা, ক্রল করে পিছু হটছে। ট্রাকের পাশ থেকে বড় ঝোপটা মাত্র কয়েক গজ দূরে, বাঘের বাচ্চার মত বুকে হেঁটে সেটার ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢোকার পর থামল না, মাথা নিচু করে সিধে হলো, ঢাল বেয়ে দ্রুত ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

একবার থামল রানা। তিনটে ছায়ামূর্তিকে দেখল ওর ফেলে আসা ঝোপটার দিকে ছুটছে। তিনজন প্রায় একযোগে গুলি করল ঝোপে, পাল্টা গুলি না হওয়ায় একদিক থেকে ঝোপের ভেতর ঢুকে ট্রাকটাকে পাশ কাটাবার জন্যে আরেকদিক থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে ছুটল–ধরে নিয়েছে কাভার থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে গেছে রানা।

আবার ঢাল বেয়ে উঠছে ও। সামনের ঝোপটাকে অনেকটা দূর থেকে পাশ কাটাল, কারণ জানে ফ্লেয়ার গান নিয়ে ভেতরে একজন বসে আছে।

সময় একটু বেশি লাগলেও, লোকটার পিছনে চলে এল রানা। সাবধানী লোক, কান পেতে অপেক্ষা করছে। নদীর দিকে ছুটে যাওয়া সঙ্গীদের আলো দরকার, কাজেই আবার সে ফ্লেয়ার গান লোড করতে শুরু করল। স্যাৎ করে রানার তালুতে নেমে

এল ছুরিটা। লক্ষ্যস্থির করল, ছুঁড়ল, দেখল ছুরির টেমপারড্ স্টীল তার পাঁজর ভেদ করে হাতলের গোড়া পর্যন্ত ঢুকে গেল। লোকটা ঢলে পড়ল, দ্রুত পায়ে হেঁটে ছুরিটা উদ্ধার করল রানা, ফ্লেয়ার গান গুঁজে রাখল বেল্টে।

সঙ্গে এখন ল্যুগার, রাইফেল ও ফ্লেয়ার গান। এক পাশ থেকে সারপ্রাইজ অ্যাটাক-এর জন্যে এই স্পটও আদর্শ। রানা বিসমিল্লাহ করল রাইফেল দিয়ে, দ্রুত গুলি ছুঁড়ে প্রথম দফাতেই তিনজনকে ফেলে দিল, বিড়বিড় করে আপনমনে বলল, 'আর যাবি লরির দিকে?'

এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপ হয়ে উল্টোদিকে ছুটল ওরা; একটু ধৈর্য ধরলেই পানির মত সহজ টার্গেট পেয়ে যাচ্ছে রাইফেল, ট্রিগারের মাধ্যমে নির্দেশ পেয়ে আরও তিনজনকে টপাটপ ফেলে দিল। বাকি যারা বুদ্ধি করে ঝোপ থেকে বেরোয়নি, কোত্থেকে গুলি হচ্ছে বোঝার পর পাল্টা গুলি করল। রানার ঝোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটা বুলেট একটু ঘষা খেলো কাঁধে। নদীর দিক থেকে আরও তিনজন ছুটে ফিরে আসছে। আসছে নিচ থেকে ওপরে, রানার ডান দিকে। ওদের আরেকটা দল রয়েছে বাম দিকে। অর্থাৎ রানা মাঝখানে। এখন যদি ওরা পরস্পকে গুলি করে, মানে যদি সেমসাইড হয়, রানা রেফারির ভূমিকা নিয়ে বাঁশি বাজাতে রাজি হবে না।

চিৎ হলো রানা, বাঁ হাতে রাইফেল ধরে বাম দিকে কয়েকটা গুলি করল লক্ষ্যস্থির না করেই। অপর তিনজন কাছাকাছি পৌঁছাল, রাইফেল তুলছে; মাটি থেকেই ট্রিগার টানল রানা, তিনবার গর্জে উঠে সব ক'টাকে ফেলে দিল ঢালের ওপর।

আকাশ থেকে বেগুনি আভা নিঃশেষে মুছে গেছে, গাঢ় পাহাড়ী ছায়ায় খেলা করছে শুধু চাঁদের আলো। কেটেছেঁটে দস্যুদলকে ভালই সাইজ করেছে রানা, তবে কৈ মাছের জান নিয়ে এখনও কয়েকজন রয়ে গেছে। ঠিক ক'জন জানতে হবে ওকে।

ফ্লেয়ার ছুঁড়ে আকাশটাকে আবার অপার্থিব বেগুনি আভায় উদ্ভাসিত করে তুলল। পাহাড়ে নয়, পাহাড়ের পাশে মাত্র একজনকে দেখল রানা, ফিল্ড রেডিওতে দ্রুত কথা বলছে। তারপর পাহাড়ের আধাআধি ওপরে আরেকজনকে দেখতে পেল, ক্রল করে চূড়ার দিকে উঠছে।

ভুরু তো কোঁচকাবেই। পাহাড়ী দস্যুদের কাছে ফিল্ড রেডিও থাকবে কেন? দেখা যাচ্ছে পশ্চাদপদ রুশ এলাকায় দস্যুবৃত্তিতে আধুনিকতার ছোঁয়া ভালই লেগেছে। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল রানা। শূন্যে যেন লাফ দিল লোকটা, শূন্যেই আধ পাক ঘুরে মাটিতে পড়ল। ল্যুগার বাম দিকে ঘুরিয়ে একটা ঝোপেও কয়েকটা গুলি করল। ওটা কাঁপছিল। ভেতরেই সিধে হলো এক লোক, টলতে টলতে বেরিয়ে এল বাইরে, তারপর সটান আছাড় খেলো। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে আরেকজন।

হাতছানি দিতে লরির তলা থেকে বেরিয়ে এল ইভা। রানাকে একটা লাশের পকেট সার্চ করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি খুঁজছ, রানা?'

'পেলে বলতে পারব,' জবাব দিল রানা। 'ডাকাতের সঙ্গে ফ্লেয়ার গান ঠিক আছে। জিনিসটা যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন নয়। তাই বলে ফিল্ড রেডিও? সরি। তাহলে তুমিও আমার বউ, দশ বাচ্চার মা।'

পকেট হাতড়ে লোকটার মানিব্যাগ বের করল রানা, ভেতরে আইডেনটিফিকেশন কার্ডও রয়েছে। 'মেজর নিকিতা পেট্রভ, রুশ আর্মি,' কার্ডের লেখাটা জোরেই পড়ল রানা। 'জানা কথা, বাকি সবাইও রুশ সেনাবাহিনীর সদস্য, চালাকি করে দস্যু বানানো হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' রানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল ইভা। ট্রাকে কেন হামলা করবে?

নিজের লোকদেরই বা খুন করবে কি কারণে?'

'জানি না,' বলল রানা। 'শুধু জানি এই ব্যাটা সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে, কাজেই এখুনি আমাদের কেটে পড়তে হবে।'

'বেনিন আমাদেরকে গায়াঙ্কায় নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার কথা বলেননি?' জিজ্ঞেস করল ইভা। 'এমনও তো হতে পারে যে এরা আসলেই দস্যু। সেনাবাহিনীর ছোট একটা গ্রুপের ওপর হামলা চালিয়ে আইডি কার্ড আর ফিল্ড রেডিও ছিনিয়ে নিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়,' সম্ভাবনাটা অস্বীকার করল না রানা। তবে দস্যুরা সাধারণত মিলিটারি ইউনিটের ওপর হামলা করে না। তাছাড়া, ডাকাতরা রেডিও ব্যবহার করতে জানে না বলেই ধরে নেয়া হয়। রানার কাছে আসলে কোন জবাব নেই, তবে সন্দেহ যেটা জাগছে সেটা যথেষ্ট জোরাল।

লরিতে ফিরে এসে ড্যাশ কমপার্টমেন্ট হাতড়াল ও। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল, এলাকার একটা ম্যাপ। রাস্তার পাশে যে নদীটা লুকোচুরি খেলছে সেটা গায়াঙ্কা ছুঁয়ে গেছে। ট্রাক ফেলে নদী ধরে যাব আমরা।' স্ট্রেচারটা কাঠের ফ্রেম আর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি, দু'জন ধরাধরি করে পানিতে নামাবার পর দেখা গেল ডিউইটকে নিয়ে ভাসছে ওটা। নদীর পানি উষ্ণ, তীরের কাছে বেশি গভীরও নয়। স্ট্রেচারটাকে গাইড করতে হচ্ছে, বেশিরভাগ সময় হেঁটে, মাঝে মধ্যে সাঁতার দিয়ে মাঝখানে সরে আসছে, স্ট্রেচারের দুই প্রান্ত ধরে আছে দু'জন।

রাস্তা ধরে বেশ অনেকগুলো ট্রাক আর মোটরসাইকেল আসা-যাওয়া করতে দেখল রানা, সবগুলোই সামরিক। তারপর দেখতে পেল এক দল লোক, পাহাড়ী দস্যুদের মত কাপড় পরা। অথচ হাঁটছে সামরিক দৃঢ়তা ও শৃংখলা বজায় রেখে। নিজের বুদ্ধির একটু তারিফ করল রানা, লরি নিয়ে রওনা হয়নি বলে।

নদী রাস্তা থেকে সরে আসতে তীরে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। দ্বিতীয়বার রওনা হয়ে হাঁটতেই থাকল, যতক্ষণ না

grohon.com

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করল। নদীর ওপর ঝুলে আছে কিছু গাছ, রাস্তা থেকে জায়গাটা দেখাও যায় না। নিচু একটা গাছের তলায় স্ট্রেচারটা রাখা হলো। ডিউইটকে একবার পরীক্ষাও করল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত, তবে অবস্থার কোনও পরিবর্তন নেই। অসাড়। দু'জন পাশাপাশি নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, এক সময় সূর্য উঠল। 'এখানে আমরা সন্ধে পর্যন্ত থাকব,' ইভাকে বলল রানা। 'দিনের আলোয় নদী আর রাস্তা, দুটোই বিপজ্জনক। সন্ধের পরপরই রওনা হলে আশা করা যায় সকালের আগেই পৌঁছে যাব গায়াঙ্কায়।'

'কিছু মনে কোরো না, কাপড়গুলো শুকাতে হবে,' বলে প্যান্ট ও শার্ট খুলে ঘাসের ওপর মেলে দিল ইভা। রানা অন্যদিকে ফিরে আছে, অনুভব করল ওর পাশে আগের জায়গাতেই আবার শুলো মেয়েটা। স্বভাবতই আড়ষ্ট একটা ভাব এসে গেল, তবে ইভার নিঃশ্বাসের শব্দ বদলে যেতে পেশিতে ঢিল পড়ল আবার, ঘাড় ফেরাতে দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে।

লুকিয়ে নারীদেহ দেখা নীচতা, জানা সত্ত্বেও প্রথমবার চোখ ফেরাতে পারল না রানা। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় চোখ ফেরানো গেল, আকাশের দিকে তাকিয়ে রাতের ঘটনা স্মরণ করল ও।

ট্রাকের ওপর হামলাটা ছিল পরিকল্পিত। ইভার ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেয়া যায় না, লোকগুলো ডাকাত হতে পারে, আইডি কার্ড আর ইকুইপমেন্ট ছিনতাই করে এনেছিল। তবে লোকগুলো ডাকাতের ছদ্মবেশে রুশ আর্মির ইন্টেলিজেন্স ইউনিটও হতে পারে। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সাবেক কেজিবির গন্ধ পাচ্ছে রানা। কেজিবি অফিসারদের অদ্ভুত একটা প্রবণতা ছিল বেঈমানী করার। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কেজিবিরও এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কেজিবির জায়গায় রুশ ইন্টেলিজেন্স আছে, কেজিবির রুশ অফিসাররাই এখন সেখানে চাকরি করে। বেনিনও সাবেক কেজিবিরই একজন অফিসার।

কেজিবির সঙ্গে কবীর চৌধুরীর সব সময় সুসম্পর্ক ছিল, এই তথ্যটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। কে জানে, বেনিন ও কবীর চৌধুরী অতীতে হয়তো একসঙ্গে কাজও করেছে।

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর রুশ প্রজাতন্ত্রে ক্ষমতার যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তাতে কমিউনিস্টদের পরাজয় হয়। কিন্তু পরাজয় মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বোঝায় না। যারা যুগের পর যুগ একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে ছিল, সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শকে বিসর্জন দেয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই লোকগুলো রুশ সমাজের প্রতিটি স্তরে আছে—আছে প্রশাসনে, পুলিসে, সেনাবাহিনীতে, ইন্টেলিজেন্সে।

সুযোগ পেলে তারা প্রতিশোধ নেবে না? বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে না?

'যত খুশি পানি খাও, নদী শুকাবে না,' দুপুরে ঘুম ভাঙার পর ইভাকে বলল রানা। 'আর যদি বলো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুলে রানাকে প্রায় হকচকিয়ে দিল ইভা। 'আমার জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি কি দুনিয়ার সবচেয়ে ভদ্র মানুষ, নাকি অক্ষম, নাকি আমাকে তোমার আসলে পছন্দ হয়নি?'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ক্ষীণ একটু হেসে মাথা নাড়ল রানা, বলল, 'কোনটাই ঠিক নয়। দায়ী আসলে তোমার ঘুম আর তৃতীয় পক্ষ।'

গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে বসে সময়টা পার করে দিল ওরা। সন্ধের পর স্ট্রেচার নিয়ে নদীতে নামল আবার। পথে গায়াঙ্কা পর্যন্ত কিছু ঘটল না বা কোন সমস্যা হলো না। গায়াঙ্কা ছোট একটা গ্রাম, এয়ারফিল্ডটা গ্রামের বাইরে। ফিল্ডের একপাশ দিয়ে এগিয়েছে নদী। ওরা পৌঁছাল ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে। তীরে উঠে দ্রুত কাপড় পরার সময় রানা লক্ষ করল গোটা ফিল্ডে কোন গার্ড নেই, অরক্ষিত পড়ে আছে।

grohon.com

grohon.com

'প্লেনটা এখনও আছে বলে মনে করো?' ইভার গলায় সন্দেহ। 'কাল আমাদেরকে আসতে না দেখে ফিরে গিয়ে থাকলে?'

রানার ঠোঁটে নিষ্প্রাণ, তিক্ত হাসি ফুটল। 'কে জানে, ওটা হয়তো এখানে আসেইনি। তবে এবার আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। মামার সঙ্গে এখানেই থাকো তুমি। আমি দেখি কোনও প্লেন পাই কিনা।'

হ্যাঙ্গারগুলো সরাসরি রানার সামনে, ফিল্ডের পিছন দিকটার এক সারিতে। মাথা নিচু করে ছুটল রানা, খেয়াল করল ভোরের প্রথম ম্লান আলো অন্ধকার আকাশের নাগাল পেতে চাইছে। সবচেয়ে কাছের হ্যাঙ্গারটার সাইডডোর খোলা দেখে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ও। তিনটে প্লেন, সবগুলোই ছোট। দ্বিতীয় হ্যাঙ্গারটা রিপেয়ার শপ, চারদিকে প্লেনের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও নানারকম যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে রয়েছে।

তৃতীয় হ্যাঙ্গারে পুরানো একটা টি-ইউ-টু লাইট বমার পাওয়া গেল। মান্ধাতা আমলের পিস্টন এঞ্জিন হলেও প্লেনটা আকারে বড়, রেঞ্জও জাপানে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট। ট্যাংক ভরা তেল আছে। ককপিটে উঠে রানার মনে হলো সব ঠিকঠাকই আছে। তবে সত্যি তা আছে কিনা বোঝা যাবে স্টার্ট দেয়ার পর।

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছে, ছোট একটা ফুয়েল ট্রাক ছুটে এল। হ্যাঙ্গারের গায়ে পিঠ সেঁটে কাঠ হয়ে থাকল রানা। ট্রাকে খাকি জাম্প সুট পরা দু'জন রুশ সৈনিক রয়েছে। ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি বলেই, তা না হলে ঠিকই ওদের চোখে ধরা পড়ে যেত রানা। ট্রাক চলে যাবার পর সাবধানে নদীর ধারে ফিরে এল ও।

স্ট্রেচার ওদেরকে দেরি করিয়ে দেবে, ডিউইটকে কাঁধে তুলে নিল রানা। একহাতে তাঁকে ধরে আছে, অপর হাতে ল্যুগার। ইভা ওর পাশে। ফিল্ডের কিনারা ধরে হ্যাঙ্গারের পিছনে চলে এল ওরা,

তারপর দেয়াল ঘেঁষে এগোল। সাইড ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে, প্লেনে উঠে ন্যাড়া কেবিনে ডিউইটকে শোয়াতে কোন সমস্যা হলো না। কিন্তু তারপরই শুনতে পেল হ্যাঙ্গারের দরজা খুলে যাচ্ছে। ইভা এখনও প্লেনের বাইরে, প্লেনের গায়ে রানার খাড়া করা সিঁড়ির গোড়ায়। নোজ উইন্ডো দিয়ে রানা দেখল সাদা কভারঅল পরা তিনজন রুশ মেকানিক দরজার কবাট ওপরে তুলে দিয়ে হ্যাঙ্গারে ঢুকছে। ইভাকে দেখতে পেয়েই ধরার জন্যে ছুটল তারা। ঘুরে দৌড়াল ইভা, কিন্তু গ্রিজে পড়ায় পিছলে গেল পা, দড়াম করে আছাড় খেলো। ছুটে এসে মেকানিকরা ঘিরে ফেলল তাকে, টেনে দাঁড় করাল একজন।

এখুনি শব্দ করার ইচ্ছা নয় রানার, পাইলটের কেবিনে একটা রেঞ্চ দেখতে পেয়ে তুলে নিল, তারপর লাফ দিল নিচে।

একজন রাশিয়ানের মাথায় বজ্রপাত ঘটল, সে ধরাশায়ী হতেই রেঞ্চটা আধ পাক ঘুরে পাশের লোকটাকে আঘাত করল, দাঁড়ানো জায়গাতেই ঢলে পড়ল সে। রানা ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, তৃতীয় লোকটা ইভাকে ছেড়ে লাফ দিল। তাকে ফ্লাইং কিক মারল রানা, মেঝেতে নামল বেড়ালের সাবলীলতায়। পাঁচ ফুট দূরে মেঝের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল লোকটা।

বজ্রাহত লোকটা সিধে হয়ে পালাচ্ছে। ইভা একটা পা বাড়িয়ে দিতে দড়াম করে আছাড় খেলো সে।

ছুরিটা হাতে চলে এসেছে রানার, হ্যাঙ্গারের দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে আসছে দু'জন লোক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখে যা বোঝার বুঝে নিল তারা, পরমুহূর্তে খিঁচে দৌড় দিল। ফিল্ডের মাঝখান দিয়ে ছুটছে তারা, চিৎকার শুনে মনে হলো কেয়ামতের আগাম ঘোষণা।

'প্লেনে ওঠো!' বলে হ্যাঙ্গারের ভেতর দিকে ছুটল রানা। যে-কোন ধরনের একটা ডাইভারশন দরকার ওর, রাশিয়ানরা যাতে সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এক কোণে, যেন ওর প্রয়োজনের কথা

grohon.com

ভেবেই রাখা হয়েছে, দশ ড্রাম ফুয়েল। প্লেনটা ওগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, কাজেই ড্রামগুলোর সঙ্গে ওদেরও উড়ে যাবার আশঙ্কা নেই। অন্তত এখুনি নয়।

ফিরে এসে প্লেনে উঠল রানা, দরজা ধরে বাইরের দিকে ঝুলে ল্যুগারটা ওই ড্রামগুলোকে লক্ষ্য করে খালি করল। সগর্জনে শুরু হলো অগ্নিশিখার বিস্ফোরণ। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। প্লেন একবারই মাত্র জোরাল একটা ঝাঁকি খেয়েছে। হুইলের পিছনে বসে এঞ্জিনের সুইচ অন করল ও, ভীতিকর চিন্তাটা পাগল করে দেবে মনে হচ্ছে—প্লেনটাকে যদি এঞ্জিন মেরামতের প্রয়োজনে হ্যাঙ্গারে ঢোকানো হয়ে থাকে, তাহলে এখানেই ঘটে যাবে সব খেলার অশুভ পরিসমাপ্তি। চিন্তাটা আতঙ্কে পরিণত হলো স্টার্টার সুইচে আবার চাপ দিতেও যখন কিছু ঘটল না।

তিনবারের বার ঝেড়ে কাশল, তারপর একযোগে গর্জে উঠল দুটো এঞ্জিন। গরম হতে দেয়ার সময় কোথায়, আগুনের আঁচ প্লেনের গা থেকে রঙের ছাল ছাড়াতে শুরু করেছে। টি-ইউ-টু নিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল রানা, সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রানওয়ে। মেইন বিল্ডিং থেকে এক দল লোককে ছুটে আসতে দেখল ও। হ্যাঙ্গারের দিকে ছুটছে তারা, তারমানে বোধহয় ধরে নিয়েছে প্লেনটাকে তাদেরই কোন লোক নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরই চোখে পড়ল মেইন বিল্ডিং থেকে হাতে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে আসছে আরেক দল লোক। স্পীড বাড়িয়ে রানওয়ের দিকে প্লেন ছোটাল ও। গার্ডরা টারমাকে হাঁটু গেড়ে লক্ষ্য স্থির করছে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল কেবিনের গায়ে অন্তত দুটো বুলেট লেগেছে।

'সাবধান!' ইভাকে সতর্ক করল রানা। পাঁচ কি ছয়টা বুলেট প্লেনের নিচের দিকে কোথাও আঘাত করল। রানওয়ে পুরোটা পার না হয়েই টেক অফ করল ও। দু'জন গার্ড ছুটে বিল্ডিঙে

ঢুকছে দেখে বুঝতে বাকি থাকল না রেডিওরূমে যাচ্ছে ওরা।

প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে সাগরের দিকে রওনা হলো রানা। ইভাকে পাইলটের কেবিনে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মামার খবর বলো।'

'কোন পরিবর্তন নেই। তবে আমরা এখন নিরাপদ, তাই না?'

'না, এখনও নই।' রানা গম্ভীর। রেডিও অন করে ক্যারিয়ারকে ডাকল ও।

'কি দরকার বলুন,' ক্যারিয়ারের রেডিওরূম জানতে চাইল।

'গায়ে রুশ এয়ারফোর্সের মার্কিং আছে, আমি একটা টি-ইউ-টু চালাচ্ছি,' বলল রানা। 'জাপান সাগরের ওপর দিয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পুব দিকে যাচ্ছি। অবাঞ্ছিত সঙ্গী জুটতে পারে। এখুনি এসকর্ট কাভার দরকার। রিপিট, এখুনি।'

'কে স্কোয়াড্রন ফ্যান্টম টেক অফ করছে। কোর্সে থাকুন, আমরাই আপনাকে খুঁজে নেব।

সেট বন্ধ করে ফুল স্পীড, ঘণ্টায় তিনশো পঁয়তাল্লিশ মাইল তুলল রানা। চোখের সামনে লাল টকটকে সূর্য জ্বলছে। বেচারা বুড়ো প্লেনটা ঝনঝন আওয়াজ তুলে কাঁপতে শুরু করায় স্পীড একটু কমাল ও। 'জানালা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম করো,' ইভাকে পরামর্শ দিল। 'কোন প্লেন দেখতে পেলে চেঁচাবে।'

'সত্যি ধাওয়া করবে?' জিজ্ঞেস করল ইভা। 'এখনও তোমার ধারণা, যা কিছু ঘটল তার জন্যে বেনিন দায়ী?'

'অনুভূতি কি বিসর্জন দেয়া যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। একটু পর আবার বলল, 'আমরা কিভাবে পালাচ্ছি, বেনিন সম্ভবত এখনও তা জানে না। এই মুহূর্তে এটা একটা প্লেন চুরির ঘটনা মাত্র।'

ইভা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কেশে উঠে তাকে থামিয়ে দিল স্টারবোর্ড এঞ্জিন, তারপর আরেকটা কাশি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোক বাটনে ঘন ঘন ঝাপটা মারল রানা, শ্বাস টানার সময় ফুলে

ফুলে উঠছে নাকের ফুটো। সগর্জনে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন। আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, নাড়াচাড়া করে ক্র্যাম্প মুক্ত হবার চেষ্টা করছে, অকস্মাৎ শুনতে পেল নতুন যান্ত্রিক গর্জন, ইভার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাতে দেখল লাল সূর্য থেকে বেরিয়ে আসছে এক ঝাঁক ফ্যান্টম। মাথার ওপর সরে এসে বাংলা সংখ্যা ৪ তৈরি করে চক্কর দিতে শুরু করল ওগুলো। স্বস্তিকর একটা দৃশ্য।

'এরকম কসরৎ দেখাবার কি কারণ?' জানতে চাইল ইভা। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে আনন্দ আর ধরে না।'

'আমাদের গতি ঘণ্টায় সাড়ে তিনশো মাইল।' হাসল রানা। 'ওদের পনেরোশো। এইট তৈরি করছে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে।'

হেসে উঠে ইভা বলল, 'রুশ এয়ারফোর্সের পাইলটরা ভয়ে কাছেও আসবে না, অবস্থা দেখে দূর থেকেই কেটে পড়বে।'

নিরাপদেই ক্যারিয়ারে পৌঁছাল ওরা। ডেকে টি-ইউ-টু ল্যান্ড করাতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা, তবে কোন বিপদ ঘটল না।

নয়

একটা নেভী জেট ওদেরকে উপকূলে পৌঁছে দিল, আরেকটা প্লেন তুলে নিয়ে নামিয়ে দিল ওয়াশিংটনে। টারমাকেই অপেক্ষা করছিল অ্যামবুলেন্স, সাইরেন বাজিয়ে ওয়াল্টার রীড হসপিটালে নিয়ে এল ওদেরকে। ডাক্তারদের আগেই যা বলার বলে রেখেছেন সিআইএ

চীফ, ড. ডিউইটকে নিয়ে বিশাল হাসপাতালের ভেতরে হারিয়ে গেল তারা। তাদের মাথা, ড. ম্যাকমিলন, রানাকে বললেন, 'রোগী সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিতে পারব। রিপোর্ট না পেলে আটটার দিকে যোগাযোগ করবেন।'

হিলটন ইন্টারন্যাশনালে, নিজের স্যুইটের পাশের একটা কামরা বুক করল রানা টেলিফোনে। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফেরার পথে একটা শপিং কমপ্লেক্সে থেমে ইভার জন্যে কিছু কাপড়চোপড় ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস কিনল। ইভা কোন প্রশ্ন করল না, কাজেই রানা ধরে নিল সে জানে তার মামার বাড়ি বিস্ফোরিত হয়েছে।

ইভাকে তার রুমে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে রানা, প্রশ্নটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তুমি খুব অস্বস্তি বোধ করছ, তাই না?'

'কি নিয়ে?'

'ব্যর্থতা নিয়ে। কোন সাফল্য নেই, শুধু কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তোমার শত্রু হয়ে ওঠার পিছনে বেনিনের স্বার্থটা কি? কবীর চৌধুরী কুরিল থেকে ভাইরাসটা নিয়ে কোথায় পালালেন?'

'তুমি আর আমি এখনও বেঁচে আমি, এটাকে তুমি ব্যর্থতা বলবে?' রানা হাসছে।

ইতস্তত করে ইভা কিছু বলতে যাবে, দু'জনেই শুনতে পেল পাশের স্যুইটে টেলিফোন বাজছে।

স্যুইটের তালা খুলে ফোন ধরতেই রানার ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গেল, বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর বাজল কানে। 'রানা?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। 'মি. স্যান্ডফোর্ডের অফিসে দশ মিনিটের মধ্যে চলে এসো, এখন থেকে পনেরো মিনিট পর ভ্লাদিমির বেনিন ফোন করবে।'

'স্যার, আপনি এখানে–ওয়াশিংটনে?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট করছ কেন?' যোগাযোগ কেটে দিলেন রাহাত খান। রানাও বসের নির্দেশ পালন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

grohon.com

ইভার কাছ থেকে বিদায় নেয়াও হলো না, কোন রকমে কাপড় পাল্টে নিচে নেমে ট্যাক্সি নিল রানা। রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম লেগে আছে, সিআইএ অফিসে পৌঁছাতে দু'এক মিনিট দেরি হয়ে গেল ওর। তবে বেনিনের কলটাও আসতে দেরি হচ্ছে। সিআইএ চীফের অফিসে ঢুকে দেখল রাহাত খান কার্পেটের ওপর পায়চারি করছেন, কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে আছে, দাঁতে আটকানো হাভানা চুরুট থেকে বাষ্পচালিত এঞ্জিনের মত গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ড নিজের ডেস্কের পিছনেই রয়েছেন, তবে দাঁড়িয়ে-কি যেন খুঁজছেন তিনি।

রানাকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন রাহাত খান, ওর হাতে টাইপ করা একটা কাগজ গুঁজে দিলেন। 'কোড করা মেসেজ। মি. স্যান্ডফোর্ডের ছেলেরা ডিকোড করে দিয়ে গেল।'

লেখাটা দ্রুত পড়ল রানা।

'ওয়াশিংটন সময় আটটা পনেরোয় রেডিওফোনে যোগাযোগ করব। বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে ঘিরে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ভ্লাদিমির বেনিন, রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স।'

পড়া মাত্র শেষ হয়েছে, ডেস্কের তিনটে লাল ফোনের একটা বেজে উঠল। রিসিভার তুললেন স্যান্ডফোর্ড। 'সিআইএ।...হ্যাঁ, ভ্লাদিমির বেনিন, ড. ডিউইটকে নিয়ে মি. রানা নিরাপদেই ফিরে এসেছেন।...হ্যাঁ, আপনি এবং আমরা সবাই স্বস্তি বোধ করছি...ধন্যবাদ। আসলে, এই মুহূর্তে মি. রানা আমার অফিসে। আপনি বোধহয় তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইবেন।' রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'রানা,' শুধু নিজের নামটা উচ্চারণ করল ও।

বেনিন শুরু করল ভারী গলার রাশ টেনে, শব্দ নির্বাচনে সাবধানী। 'আমাদের লরির ওপর দস্যুদলের যে হামলাটা চালানো হলো, তার জন্যে নিজেকেই আমি দায়ী করছি এবং বন্ধু হয়ে

বন্ধুর নিরাপত্তার কথাটা আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করায় প্রবল অপরাধ বোধেও জর্জরিত হচ্ছি। সেই রাতে তোমরা গায়াঙ্কায় না পৌঁছানোয় আমরা সময় নষ্ট না করে কি ঘটল দেখার জন্যে একটা ফোর্স পাঠিয়েছিলাম। ওরা লরির কাছে পৌঁছে আমাদের দু'জন সৈনিক আর দস্যুদের লাশ দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রিপোর্ট করে। স্বভাবতই আমরা ধরে নিয়েছিলাম তোমাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পরদিন রাতে যখন জানতে পারলাম গায়াঙ্কা থেকে আমাদের একটা প্লেন চুরি হয়েছে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না আসলে কি ঘটেছে। প্রিয় বন্ধু, তুমি এয়ারপোর্টে গিয়ে অফিসারদের বললেই তারা আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দিত। কিন্তু তা তুমি করলে না কেন?'

'ওরা আমার গল্প বিশ্বাস করবে বলে মনে হয়নি।'

'তোমার দিক থেকে ওটাই হত স্বাভাবিক ও সহজ আচরণ,' বলল বেনিন। 'সব পানির মত সমাধান হয়ে যেত। তবে কিছু আসে যায় না, ড. ডিউইটকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে যেতে পেরেছ তোমরা, এরচেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কি হতে পারে! এটাই আমার প্রতিমুহূর্তের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল। আবার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, পথে দস্যুদল হামলা করতে পারে, এই চিন্তা আমার বিবেচনায় অবশ্যই থাকা উচিত ছিল।

'তোমাকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই আমি, রানা। আমি বড় একটা ফোর্সকে তল্লাশীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, গোটা এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজছে তারা। ভাইরাসটা পাওয়া মাত্র তোমাকে আমি জানাব।'

'হ্যাঁ, প্লীজ। ধন্যবাদ, বেনিন-অসংখ্য।'

টেলিফোন ডেড হয়ে গেল, রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। মুখ তুলতে দেখল রাহাত খান ও স্যান্ডফোর্ড সাবধানে একটা করে মনিটরিং ফোন নামিয়ে রাখছেন। বসের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর।

grohon.com

'আর দু'দিন পর ওয়ার্ল্ড লীডারশিপ কনফারেন্স–গোলটেবিল বৈঠক,' নতুন আরেকটা হাভানা ধরাবার ফাঁকে বললেন রাহাত খান। 'কবীর চৌধুরীর পরিকল্পনা সম্পর্কে ড. ডিউইটের কাছে সত্যি যদি কোন তথ্য থাকে, তা জানার জন্যে তোমাকে আমি মাত্র আর একটা দিন সময় দিতে পারি। ওই কনফারেন্সে তোমাকে আমার দরকার, কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীও অংশগ্রহণ করছেন। ইতিমধ্যে তুমি যদি নতুন কোন তথ্য বা থিওরি পাও, আমি শুনব, ঠিক আছে?'

স্যান্ডফোর্ড এখনও দাঁড়িয়ে, রাহাত খান আবার পায়চারি শুরু করায় রানাও বসতে পারছে না।

নিস্তব্ধতা দীর্ঘ হতে না দিয়ে স্যান্ডফোর্ড বললেন, 'হসপিটাল থেকে ড. ম্যাকমোহন ফোন করেছিলেন, মি. রানা। বলছেন, ড. ডিউইটের জ্ঞান ফিরে পাবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই। ব্রেইন ড্যামেজটা গুরুতর। তবে ডাক্তার এ-কথাও বলছেন, সবার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে এ-ধরনের রোগী দু'এক মুহূর্তের জন্যে সচেতন হবার ঘটনাও মাঝে-মধ্যে ঘটে। তিনি আমাদেরকে এক ঘণ্টা পর পর খবর নিতে বলেছেন।'

'দুঃখিত, মি. স্যান্ডফোর্ড,' পায়চারি থামিয়ে রাহাত খান বললেন। 'আমার ধারণা আপনারা দু'জনেই কবীর চৌধুরীকে আন্ডারএস্টিমেট করছেন। তার আর ডিউইটের যৌথ পরিকল্পনা ছিল কামবারল্যান্ড থেকে ভাইরাসটা চুরি করা, সেটা সফল হওয়ায় কবীর চৌধুরীর দৃষ্টিতে ওই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ডিউইট ছিলেন কবীর চৌধুরীর জিম্মি। আর অপরাধী কখনও জিম্মিকে তার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানায় না।'

'কবীর চৌধুরীর সেই পরিকল্পনাটা কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?' রাহাত খানের বাড়ানো হাত থেকে একটা হাভানা নিয়ে প্রশ্ন করলেন সিআইএ চীফ।

'সে-ব্যাপারে পরে আসছি,' বললেন রাহাত খান। 'কবীর চৌধুরীর দৃষ্টিতে তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা মাসুদ রানা। সেজন্যেই সে ডিউইটকে খুন করার আগে রানাকে খুন করাটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। রানাকে সেজন্যেই সে কৌশলে কুরিলে নিয়ে যায়।'

'মি. রানাকে সে কৌশলে কুরিলে নিয়ে যায়, তার মানে?' স্যান্ডফোর্ড বিস্মিত।

'আপনাদের মীটিঙের যে বিবরণ আমাকে আপনি পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে কবীর চৌধুরী আর ডিউইট যে পালিয়ে কুরিলে চলে গেছেন, এই তথ্যটা সরবরাহ করে বেনিন। এমনকি চ্যালেঞ্জের সুরে সে-ই রানাকে কুরিলে যাবার প্রস্তাবও দেয়।'

'ওহ্, গড! তারমানে আপনি বলছেন ভ্লাদিমির বেনিন কবীর চৌধুরীর হয়ে কাজ করছেন?' স্যান্ডফোর্ডের চোখে পলক পড়ছে না।

'আমি বলছি, বেনিনের মাধ্যমে রুশ ইন্টেলিজেন্সের একটা প্রভাবশালী মহল কবীর চৌধুরীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমার ধারণা, তারা প্রায় সবাই সাবেক কেজিবি কর্মকর্তা। তাদের উদ্দেশ্য, বর্তমান সরকারকে সরিয়ে কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা। এই কাজে ভাইরাসটাকে একটা উপাদান হিসেবে কবীর চৌধুরীর মাধ্যমে ব্যবহার করতে চাইছে তারা। আর কবীর চৌধুরী যেহেতু আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদ একজন সমাজসংস্কারক ও দার্শনিক, হাজার বছর ধরে শিউরে ওঠার মত একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাবার সুযোগ সে-ও এখন হাতছাড়া করতে রাজি নয়। দু'পক্ষের টার্গেট দুটো পাখি, ঢিল ওই একটাই–ভাইরাস X-99।'

'ইন্টারেস্টিং, রিয়েলি মোস্ট ইন্টারেস্টিং!' মাথা ঝাঁকালেন স্যান্ডফোর্ড, রাহাত খানের ব্যাখ্যায় তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। ডেস্কের পিছন থেকে সরে এসে ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন। তারপর, 'প্লীজ!' বলে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসে

grohon.com

ধীরেসুস্থে ধরালেন চুরুটটা।

স্যান্ডফোর্ডের দেখানো চেয়ারটায় বসলেন রাহাত খান। 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, যেন এইমাত্র লক্ষ করলেন ব্যাপারটা।

রানা স্যান্ডফোর্ডের পাশের চেয়ারটা খালি রেখে আরেকটা চেয়ারে বসল।

একরাশ নীল ধোঁয়া ছেড়ে স্যান্ডফোর্ড বললেন, 'ঠিক আছে, বুঝলাম, মি. রানাকে খুন করার জন্যেই কুরিলে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। তাহলে ডিউইটকেও কবীর চৌধুরী সেখানে খুন করল না কেন? খুন করার জন্যে তাঁকে চাঙকুফেঙে নিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে? আরও একটা বিষয় আমি বুঝছি না—কুরিল থেকে রওনা হলো কবীর চৌধুরী, কিয়াংশি ও ডিউইট। চাঙকুফেঙে ডিউইট গুলি খেলেন। কিয়াংশি পালিয়ে গেল। কিন্তু কবীর চৌধুরী? তাকে চাঙকুফেঙে দেখা গেল না কেন?'

'আসলে চাঙকুফেঙে একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছিল,' বললেন রাহাত খান। 'সেখানে একটা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। নাট্যকার ও পরিচালক ছিল কবীর চৌধুরী, আর অভিনেতা ছিল বেনিন। ডিউইট? তিনি এই নাটক সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁকে হত্যা করার জন্যে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হলেও, এর পিছনে আরও কারণ ছিল। তার একটা, নিজেকে রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে বিশেষ একটা স্থানের প্রয়োজন ছিল কবীর চৌধুরীর, সেই বিশেষ জায়গাটা হলো চাঙকুফেং। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল করার জন্যে রুশ ইন্টেলিজেন্সের সাংগঠনিক শক্তি ও আধুনিক অ্যাপারেটাস দরকার কবীর চৌধুরীর। আমার ধারণা, মস্কোয় চলে গেছে সে, রুশ মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ সেরে গোপনে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসবে।

'যে-কথা বলছিলাম। কবীর চৌধুরীকে চাঙকুফেঙে দেখা যায়নি, কারণ সীমান্ত থেকে আগেই মস্কোয় চলে গেছে সে,

ডিউইটকে খুন করার দায়িত্ব বেনিনকে দিয়ে। যাবার সময় ভাইরাসটাও সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

'তবে যে বেনিন বলছে ওটা তারা খুঁজছে?'

'খুঁজে পাবেও,' মুচকি হেসে বললেন রাহাত খান। 'পাবে, কিন্তু কাউকে দেখতে দেবে না বা হস্তান্তরও করবে না। বলবে, এরকম ভয়ঙ্কর একটা ভাইরাস দুনিয়ার বুকে না থাকাই ভাল, তাই ওটা তারা ধ্বংস করে ফেলেছে।'

'গড! গড! গড!' মাথার চুলে হাত বোলালেন স্যান্ডফোর্ড।

'আপনি কিন্তু এখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেননি, ওই নাটকের দর্শক কে ছিল। আমন্ত্রিত দর্শক ছিল মেজর ঝাং ঝিয়াং, কিন্তু পৌঁছাতে তার দেরি হয়ে যায়। এটা ছিল বেনিনের চালাকি, সে এমন সময়ে ঝিয়াংকে ডাকে, এসে যাতে দেখে যা ঘটার ঘটে গেছে। আর রানা ছিল অপ্রত্যাশিত দর্শক। যাই হোক, পৌঁছাতে দেরি করলেও, নাটকের শেষ দৃশ্যটা ওদের জন্যে সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল বেনিন। ঝিয়াং তার ষড়যন্ত্র ধরতে পারেনি, ঘটনার বর্ণনা বিশ্বাস করে ফিরে গেছে। কিন্তু তুমি, রানা?'

'বেনিনকে আমি বেনিফিট অভ ডাউট দিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'আপনার ব্যাখ্যা শোনার পর সেটা প্রত্যাহার করে নিলাম।'

'এখন প্রশ্ন হলো, বিপদটা কোন্ দিক থেকে আসবে?' জিজ্ঞেস করলেন স্যান্ডফোর্ড। 'আপনি বললেন, কবীর চৌধুরী নিউ ইয়র্কে ফিরে আসবে। তারমানে, আপনার ধারণা, গোলটেবিল বৈঠকই তার টার্গেট?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন রাহাত খান। 'এতবড় সুযোগ সারা জীবনে একবারই আসে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি তার আক্রোশ তো নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার যে করুণ ছবি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, কবীর চৌধুরী সেজন্যে রাষ্ট্রপ্রধানদেরই দায়ী করে। কাজেই তাঁদের সবাইকে এক সঙ্গে বিদায় করার এই সুযোগ সে ছাড়বে কেন। ভাইরাসটা সে চুরিই করেছে এই কাজের জন্যে।'

'আমাদের করণীয়?'

'করণীয় ঠিক করতে হলে ক্লু দরকার,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা জানি কবীর চৌধুরী কি করতে চায়। কিন্তু জানি না কিভাবে কাজটা করবে।'

'আপনার আইডিয়া থেকেই আমি একটা বাচ্চা বের করি?' সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন সিআইএ চীফ। 'আপনি বলেছেন, কবীর চৌধুরী মনে করে তার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দেবেন মি. রানা। সেজন্যেই ওঁকে খুন করার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়। একবার নয়, দু'বার। কিন্তু মি. রানা এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। কাজেই আমরা যদি ধরে নিই কবীর চৌধুরী বা রুশ ইন্টেলিজেন্স আবার ওঁকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করবে, তাহলে কি ভুল হবে?'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বললেন রাহাত খান। 'রানার জন্যে আবার ফাঁদ পাতবে ওরা। আর ক্লু পেতে হলে সেই ফাঁদে রানাকে ধরাও দিতে হবে।'

এই সময় ডেস্কের একটা ফোন বেজে উঠল। সেটা ধরার জন্যে হাতটাকে একটু বেশি লম্বা করতে হলো স্যান্ডফোর্ডকে। রিসিভারে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, নিয়ে এসো।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রাহাত খানের দিকে তাকালেন তিনি। 'ভ্লাদিমির বেনিন একটা তার পাঠিয়েছেন।'

দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকল একজন সিআইএ এজেন্ট। বসকে ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বিসিআই চীফের পাশে বসে থাকতে দেখে চুল পরিমাণ বড় হলো চোখ দুটো, তবে তার বিস্ময় এক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না। দুই প্রস্থ কাগজ স্যান্ডফোর্ডের হাতে ধরিয়ে দিয়ে রানার উদ্দেশে হাসল। রানা তাকে বলল, 'টীমের সবাইকে নিয়ে কাল সকাল দশটায় বসছি–সবাই মানে যারা ওয়াশিংটনে আছে। আমার তরফ থেকে জানিয়ে দাও, প্লীজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সিআইএ এজেন্ট।

স্যান্ডফোর্ড একটু কেশে নিচুগলায় বললেন, 'টেলিগ্রামটা আমি পড়ছি: "ওয়ার্ল্ড লীডারশিপ কনফারেন্স শুরু হবার মুহূর্তে রুশ ইন্টেলিজেন্স আরও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। মাসুদ রানাকে জানান, আমাদেরকে বলা হয়েছে কবীর চৌধুরীর লোকজনকে নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে। মেয়েটার নাম নিনা গ্লোরিয়া। ৬৬৬ ডোয়ার স্ট্রীট। সে নাকি সুমো কুস্তিগিরকে দেখেছে"।'

'এটাই সেই ফাঁদ বলে মনে করি।' রাহাত খান গম্ভীর।

স্যান্ডফোর্ডের হাতে আরেকটা কাগজ দেখা গেল। 'আমার এজেন্টরা, মি. রানার দু'জন টীমমেট, এরইমধ্যে নিউ ইয়র্ক পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে,' বললেন তিনি। 'ওটা একটা ব্রথেলের ঠিকানা–নিরাপদ পরিবেশ, শান্ত এলাকা। ওদিকটায় বেশিরভাগ চীনারাই থাকে, তবে ইদানীং রুশ মেয়েরাও আসা-যাওয়া করছে। আমার ধারণা নিনা গ্লোরিয়া বেনিনের হয়ে কাজ করে, এমন নাও হতে পারে।'

'রাইট, নিজেদের এজেন্ট বা ইনফর্মার হলে নামটা আমাদেরকে জানাত না,' বললেন রাহাত খান। 'তবে এটা ফাঁদ হোক বা না হোক, কিয়াংশিকে হয়তো সত্যি ওখানে দেখা গেছে। ফাঁদটাকে বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্যে কবীর চৌধুরী তাকে ওখানে পাঠাতে পারে।'

'মি. রানা,' স্যান্ডফোর্ড বললেন, 'আমি চাই টীমের সবাইকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে যাবেন আপনি।'

রানা মাথা নাড়ল। 'যুদ্ধ আর গুপ্তচরবৃত্তির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে–আপনিও তা জানেন। এসপিওনাজে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, আর রণক্ষেত্রে একা কেউ কখনও জিততে পারে না। ক্লু পেতে হলে আমাকে একাই যেতে হবে।'

'আমিও তাই মনে করি,' রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে

grohon.com

মুছতে রাহাত খান বললেন। 'তবে ক্লু নিয়ে তোমাকে ফিরে আসতে হবে, দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

'ইয়েস, স্যার!' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'চলো, আমার হোটেলে যাবার পথে তোমাকে আমি হিলটনে নামিয়ে দিই।'

কিন্তু রাহাত খান চেয়ার ছাড়তে গেলে বাধা দিলেন স্যান্ডফোর্ড। 'প্লীজ, জেনারেল। আপনি আমার অতিথি হিসেবে আমাদের বাড়িতে আজকের রাতটা কাটাবেন। আমার গিন্নী বারবিকিউ-এর সমস্ত আয়োজন শেষ করে আপনার অপেক্ষায় আছেন।'

'কিন্তু কাল সকালেই যে আমার ফ্লাইট, নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে হবে। তাছাড়া, লাগেজ তো সব হোটেলে রয়ে গেছে...'

'আপনার লাগেজ হোটেল কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে,' আশ্বস্ত করলেন স্যান্ডফোর্ড। 'আর কাল সকালে তো আমাকেও নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। আপনি আমার সঙ্গেই যাবেন।'

দুই ইন্টেলিজেন্স চীফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

দশ

সেই রাতেই ডি.সি. থেকে শাটল ফ্লাইট ধরে নিউ ইয়র্কে চলে এল রানা। চায়না টাউনের এই বিশেষ অংশে রাত যত গভীর হয় লোক সমাগম ও দেহব্যবসা ততই জমজমাট হয়। ডোয়ার

স্ট্রীটের ছ'শো ছেষট্টি নম্বর বাড়িটা পুরনো একটা উঁচু দালান, গ্রাউন্ড ফ্লোরে শুধুই গিফ্‌ট্‌ শপ। দোতলায় উঠে একটা ডোরবেল বাজাল রানা। দরজা খুলতেই ধূপ-ধুনোর তীব্র গন্ধ প্রচণ্ড একটা ঘুসির মত আঘাত করল নাকে। ভেতরটা ঘন ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা ইউরেইশান, বেশভূষা অগোছাল, তবে খুব কড়া মেকআপ নিয়েছে। পরনের কালো হোস্টেস গাউনে একটা লাল ড্রাগন এমব্রয়ডারি করা। তাকে পাশ কাটিয়ে হলওয়েতে চলে গেল রানার দৃষ্টি। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, একজনও চীনা নয়। ফোলা পেশী, ছোট চোখ; বোঝাই যায় যে বডিগার্ড বা 'প্রটেকশন'।

মেয়েটার চোখে অনুচ্চারিত প্রশ্ন, বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ওর মাপ ও ওজন বোঝার চেষ্টা করছে।

'এক বন্ধু এখানে আমাকে আসতে বলল। বলল, নিনা গ্লোরিয়াকে চাইতে হবে।'

মেয়েটার চোখ মাত্র এক চুল নড়ল। 'নিনা গ্লোরিয়া। আপনি ভাগ্যবান, কারণ এই মুহূর্তে সে ব্যস্ত নয়।'

ভেতরে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। ইঙ্গিত পেয়ে তার পিছু নিল রানা, হলওয়ে পার হয়ে বড়সড় রিসেপশন রুমে এসে দেখল দেয়াল ঘেঁষে ফেলা সারি সারি চেয়ারে তরুণী মেয়েরা বসে আছে। বেশিরভাগই তারা চীনা, তবে ইউরোপিয়ান ও ভারতীয় মেয়েও আছে। কারুরই ইচ্ছা নয় গা ঢেকে রাখে, কিছু একটা না পরলে নয় তাই পরা-ব্রা আর প্যান্টি যত ছোট হতে পারে। ম্যাডামকে রানা অনুসরণ করছে, তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করল রানাকে। ম্যাডাম রানাকে আরেকটা হলওয়ে হয়ে নিয়ে এল তিনতলায় ওঠার পিছনদিকের সিঁড়ির গোড়ায়। 'সোজা উঠে যান। সেকেন্ড ফ্লোর, ডানদিকের প্রথম দরজা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, গোড়ায় দাঁড়িয়ে দু'এক মুহূর্ত

grohon.com

তাকিয়ে থাকল ম্যাডাম, তারপর গাউনের খসখস শব্দ তুলে ফিরে গেল।

ধূপের এত বেশি ব্যবহার আগে কখনও কোথাও দেখেনি রানা। হলওয়ে, প্যাসেজ, সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, করিডর, প্রতিটি জায়গায় পিতলের গোল পাত্র দেখা যাচ্ছে, ভেতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। বাঁ দিকের একটা দরজাকে পাশ কাটাল রানা, ভেতর থেকে কোন মেয়ের জোর করা হাসির শব্দ ভেসে আসছে। হলওয়ে বরাবর আরও তিনটে বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের প্রথম দরজার সামনে থামল ও। নক করে হাতল ঘোরাল। কবাট খুলে মুখ তুলল ছোটখাট একটা মেয়ে, মাথায় একরাশ কালো চুল এলো করে রেখেছে।

মেয়েটা সুশ্রী। হালকা রঙ ও পাতলা কাপড়ের কিমোনো ধরনের একটা ড্রেস। কেন যেন রানার মনে হলো, এ কোন ব্রথেলের মেয়ে নয়। চোখের দৃষ্টিতে এত বুদ্ধি আর সতর্কতা, এই পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

'আসুন!' হাসিটা আন্তরিক, তারমানে বিশ পেরুবার আগেই দক্ষ অভিনেত্রী হয়ে উঠেছে। 'দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে আপনি এখানে নতুন–ঠিক বলিনি?'

গলার আওয়াজটা বিস্মিত করল রানাকে। নাকি সুর। দেখতে কুৎসিত হলে পেত্নী-টেত্নি ভাবা যেত। তবে হয়তো ঠাণ্ডা লাগাতেই গলার এই অবস্থা।

মেয়েটাকে ভয় পাওয়ানো উদ্দেশ্য নয়, তাহলে কোন তথ্যই পাওয়া যাবে না। মৃদু হেসে ঘরে ঢুকল ও। এখন যা স্বাভাবিক তাই করতে হবে ওকে, মেয়েটাকে বিশ্বাস করাতে হবে সে-ও সাধারণ একজন মক্কেল। 'হ্যাঁ,' প্রথমে নেকটাই, তারপর জ্যাকেট খুলতে শুরু করে বলল রানা। 'আমি এখানে নতুনই।' জ্যাকেটের ভাঁজে ল্যুগারটা থাকল, চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখল ওটা।

নিনা গ্লোরিয়ার পিছনে বড় একটা বিছানা। 'আমার দিকে তাকাও,' সকৌতুকে আদেশ করল সে, তারপর ফিতে ধরে একটানে শরীর থেকে খসিয়ে ফেলল কিমোনোটা। চেষ্টা করতে হলো না, সামনের দৃশ্য দেখে এমনিতেই রানার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটল। ঘুরল মেয়েটা, পালা করে দাঁড়াল বিছানার দুই প্রান্তে, দেশলাই জ্বেলে দুই পাত্রে রাখা ধূপ ধরাল।

রানার কাছে আর ফিরল না সে, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে, দুই পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে বারবার ওপরে তুলছে আর নিচে নামাচ্ছে। রানা ভাবল, ওর সন্দেহ ভুলও হতে পারে। মেয়েটা হয়তো সাধারণ একটা বেশ্যাই।

'আমার ধারণা দেখছি ভুল। ভেবেছিলাম তুমি ব্যাকুল হয়ে আছ। কই, তুমি তো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ না! দেরি করছ কেন, এসো!' গ্লোরিয়ার গলার আওয়াজ আবার অবাক করল রানাকে। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না যে কথা না বললেই মক্কেল তার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে?

চেয়ার ছেড়ে বিছানার দিকে এগোল রানা। হঠাৎ করেই বিছানার ওপর গ্লোরিয়া সংখ্যায় বেড়ে গেল–দু'জন, তিনজন, চারজন। ওর হাসি পাচ্ছে না, সেজন্যে মনে প্রশ্নও জাগল। এরকম একটা দৃশ্য দেখে হাসি না পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত সচল হলো বিছানাটা। মনে হলো, ও যত এগোচ্ছে, বিছানাটা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আরে, এরকম ঘটতে থাকলে ও বিছানার নাগাল পাবে কিভাবে!

বিছানার ওপর উঠে বসেছে গ্লোরিয়া। একজন নয়, কয়েকজন। সবগুলো গ্লোরিয়া হাসছে।

রানা ঘোরার চেষ্টা করল। ভোজবাজির উৎস চিনে ফেলেছে ও। এর জন্যে দায়ী আসলে ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া। ফিরতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল, দড়াম করে আছাড় খেলো রানা। বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত কাবু করে ফেলছে ওকে, আতঙ্কে হিম হয়ে

grohon.com

grohon.com

গেল শরীর। কাশি শুরু হলো, শ্বাস নিতে পারছে না। ক্রল করে বিছানার দিকে এগোল ও। ও কি করে দেখার জন্যে খাটের ওপর থেকে ঝুঁকে তাকাল মেয়েটা। ইতিমধ্যে বিছানার এক মাথার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। মেয়েটা বাধা দেয়ার সময় পেল না, হাতের এক ঝাপটায় ধূপদানীটা ফেলে দিল মেঝেতে। কিন্তু দ্বিতীয়টা থেকে এখনও হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অথচ অত দূরে যাবার শক্তি নেই রানার। মেঝেতে কনুই ঠেকিয়ে তাজা বাতাসের অভাবে ধুঁকছে। অনেক কষ্টে মাথাটা উঁচু করল ও, তারপর কাঠের মেঝেতে ঠকাস করে খুলি ঠুকল। ভেতরে কি ঝাঁকি খেলো না খেলো বলতে পারবে না, চোখের দৃষ্টি খানিকটা পরিষ্কার হলো, সজাগ-সচেতন ভাবটাও খানিক ফিরে এল। মেয়েটাকে কাছেই দেখতে পাচ্ছে ও, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে পারল না, সরে গেল গ্লোরিয়া।

মেয়েটার কিছু হচ্ছে না কেন? প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসছে। মাথার অনেক গভীর কোন প্রদেশে মেমোরি ব্যাংক খুলে গেল, মনে পড়ল: গ্লোরিয়া নাকি সুরে কথা বলছিল। এর একটাই অর্থ হতে পারে–ফিল্টার সহ নোজ প্লাগ। নাকের ভেতর ওটা থাকায় ফুসফুসে শুধু বাতাস ঢোকার সুযোগ পেয়েছে। অল্প একটু ধোঁয়া যদি ঢুকেও থাকে, ক্ষতি করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

ক্রল করে বিছানার আরেক দিকে যাচ্ছে রানা। কিন্তু পৌঁছবার আগেই জ্ঞান হারিয়ে থেমে গেল।

জ্ঞান ফিরল অন্ধকারে। প্রথমেই প্রশ্ন জাগল মনে, খুন করার জন্যেই ফাঁদে ফেলে অজ্ঞান করা হয়েছিল, এখনও তাহলে বেঁচে আছে কিভাবে? উত্তর পেতে দেরি হলো না। খুন করার প্রক্রিয়া চলছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পায়ের দুই গোড়ালিও এক করে বাঁধা। গায়ে সেঁটে আছে কর্কশ ক্যানভাস। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওকে একটা বস্তায় ভরা হয়েছে। টের পেল

ল্যুগারটা নিয়ে নিয়েছে ওরা। গোড়ালির কাছে মোজায় গোঁজা .২২ অ্যাস্ট্রা পিস্তলটা আছে? দু'গোড়ালি ঠুকল রানা। আছে! এঞ্জিনের আওয়াজ বলে দিচ্ছে একটা গাড়িতে রয়েছে ও। গাড়িটা এই মুহূর্তে একটা বাঁক নিচ্ছে। বস্তার ভেতর ভরে দেয়া হয়েছে ওর জ্যাকেট, পায়ের আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারছে ওটা। ডোয়ার স্ট্রীটের সেই বাড়িটায় ওর উপস্থিতির কোন প্রমাণই ওরা রাখতে চায়নি। এমনকি স্প্রীংসহ খাপে ভরা ছুরিটাও রয়েছে ডান কনুইয়ের ওপর।

গাড়িটা প্রাইভেট কার। কোথায় থামল কে জানে। পায়ের শব্দ হলো। বস্তাটা ধরাধরি করে কারা যেন তুলল, তারপর ফেলে দিল মাটিতে। ব্যথাটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল রানা। এক মুহূর্ত পর অনুভব করল বস্তাটা টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা সম্ভবত পাথরের চওড়া স্ল্যাব বসানো একটা রাস্তা বা চাতাল।

বস্তা থামল। আবার ধরাধরি করে তোলা হলো সেটা। দোল খাওয়াচ্ছে। অদম্য ইচ্ছা হলো চিৎকার করে, অনেক কষ্টে দমন করল সেটা। পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে, খাদে ফেলছে ওরা বস্তাটা?

শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার অনুভূতি। তারপর ঝপাৎ করে একটা শব্দ। পানিতে ডুবছে বস্তা। তারমানে বস্তায় ভরে ওরা তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

রানা ভিজছে না। ক্যানভাসটা ওয়াটারপ্রুফ। মুখটাও শক্ত করে বাঁধা। অতি মূল্যবান অল্প কয়েকটা সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে, জানে রানা। যত গভীরে ডুববে বস্তা, পানির চাপ ততই বাড়বে, এক সময় ওই চাপেই বস্তার মাথার দিকের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। ততক্ষণে ও এত গভীর পানিতে তলিয়ে যাবে যে ওপরে ওঠা আর সম্ভব হবে না। ফুসফুস ভরে উঠবে পানিতে। দু'এক ফোঁটা পানি এরই মধ্যে কপালে পড়তে শুরু করেছে।

বাহু থেকে খসিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হাতের তালুতে ছুরিটা আনতে পারল রানা, হাতলটা আঙুল দিয়ে ধরল। কাজটা

grohon.com

পিছন দিকে, তবে ছুরির ফলা গোড়ালির বাঁধন পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। মোটা আর শক্ত হলেও রশিটা একটু একটু করে কাটছে।

কিন্তু তলিয়ে যাবার গতি ক্রমশ বাড়ছে, যে কোন মুহূর্তে বস্তার মাথা খুলে যাবে। রশি কাটছে, তবু কাজটা শেষ করতে পারছে না। তারপর হঠাৎ করেই অনুভব করল গোড়ালি মুক্ত হয়েছে। ছুরি চালিয়ে ক্যানভাস কেটে ফেলল রানা, ঘন ঘন পা ছুঁড়ে বস্তা থেকে বেরিয়ে এল। হাত এখনও বাঁধা, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ওপরে উঠছে। ফুসফুস অচল হয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পানির ওপর মাথা তুলল রানা। রাত অন্ধকার, নদী অন্ধকার, তবে স্কাইলাইন আলোকিত করে রেখেছে নিউ ইয়র্ক শহর। উপুড় হয়ে ভাসছে রানা, আঙুলে ধরা ছুরি দিয়ে হাতের বাঁধন কাটল। তীরের দিকে সাঁতরাচ্ছে।

সাঁতরে পরিত্যক্ত একটা জেটিতে উঠল। একটু বিশ্রাম দরকার। তারপরই ট্যাক্সি নিয়ে গ্লোরিয়াকে ধরতে যাবে। কিন্তু না, শনি এখনও পিছু ছাড়েনি। জেটির কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে রানা, এদিক-ওদিক চোখ বোলাচ্ছে, হঠাৎ দু'জন লোককে দেখতে পেল। এদিকে হার্ডসন নদীর তীর পাথর দিয়ে বাঁধানো, পানি থেকে দশ-বারো ফুট উঁচু। রানাকে যেখানে পানিতে ফেলা হয়েছিল, সরাসরি তার ওপরে অর্থাৎ উঁচু বাঁধের মাথায় দাঁড়িয়ে, গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে, সিগারেট ফুঁকছে লোক দু'জন। সিগারেট ফুঁকলেও, মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পানির ওপর চোখ বোলাচ্ছে। হাসি পেল রানার, খুন করার জন্যে ভাল লোকদেরই পাঠিয়েছে কিয়াংশি।

জেটির ওপর সিধে হলো রানা। লোক দু'জন দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। ইচ্ছে করেই হোঁচট খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করল ও। উদ্দেশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এমনভাবে টলছে, দু'পা এগোয় তো এক পা পিছায়, যেন বেহেড মাতাল।

দেখতে পেয়েই ছুটল ওরা। বাতাসে একজনের চিৎকার

ভেসে এল, 'দেখো দেখি কাণ্ড, শালা উঠে এসেছে!'

'প্লীজ! আমাকে একটু সাহায্য করো। প্লীজ!' কাতর গলায় বলল রানা, কথাটা যেন শুনতে পায়নি।

জেটির গোড়ায় পা রাখল ওরা। দু'জনের চারটে হাতই দেখতে পেল রানা। খালি।

রেইলিং ধরে পড়ে যাওয়া ঠেকাবার ভান করল ও। নির্ভয়ে আরও কাছে আসুক ওরা।

জেটির ওপর ঢলে পড়ল রানা। লোক দু'জন দশ গজের মধ্যে চলে এসেছে।

'আগেই বলেছিলাম,' দু'জনের একজন নিগ্রো, সেই কথা বলছে, 'ঘাড়টা মটকে তারপর বস্তায় ভরি। কিন্তু আমার কথা তো শুনলি না।'

'কি করে জানব এ শালার কৈ মাছের জান!' শ্বেতাঙ্গ লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। 'চল, গলা টিপে জানটা আগে বের করি, তারপর আবার পানিতে ফেলে দিই।'

'একটু দাঁড়াও, ভাই,' দ্রুত সিধে হয়ে বলল রানা। 'আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।' অ্যাস্ট্রা বেরিয়ে এল হাতে।

থমকে দাঁড়াল লোক দু'জন, দূরত্ব পাঁচ গজেরও কম। মুখে কথা নেই, বোবা হয়ে গেছে।

'আমি শুধু কবীর চৌধুরী কোথায় আছে জানতে চাই,' বলল রানা। 'ঠিকানাটা বলো, পিস্তলটা পকেটে ফিরে যাবে।'

'কি নাম বললে?' নিগ্রো জানতে চাইল।

'কবীর চৌধুরী।'

'এই নাম বাপের কালেও আমরা শুনিনি।'

'তাহলে জাপানি কুস্তিগিরটার ঠিকানা বলো—কিয়াংশির।'

'জাপানি কুস্তিগির? কিয়াংশি?' শ্বেতাঙ্গ বিমূঢ়। 'এই নামও আমরা কখনও শুনিনি।'

'তাহলে কে তোমাদেরকে অর্ডার দিল?'

জবাব দিল নিগ্রো, 'ভেবেছ তোমার পিস্তলকে আমরা ভয় পাচ্ছি?' হাসল সে। 'আরে বোকা, মাথায় এইটুকু বুদ্ধিও নেই, ভেবেছ পিস্তলের গুলি আমরা বের করিনি?'

শ্বেতাঙ্গ বলল, 'গুলি থাকলেও কোন লাভ হত না, পানিতে ভেজা বুলেট পিস্তল থেকে বেরুতে লজ্জা পায়।'

'তোমরা তাহলে মরার সিদ্ধান্তই নিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওদের এত কথার কিছুই যেন ওর কানে যায়নি। 'কিয়াংশির ঠিকানা বলবে না?'

'ধর শালাকে!' যেন পিপীলিকার পাখা গজাল, দু'জন একসঙ্গে লাফ দিল রানাকে লক্ষ্য করে। হাডসন নদীর নির্জন তীরে খান খান হলো ভৌতিক নিস্তব্ধতা। দু'বার গর্জে উঠল অ্যাস্ট্রা। লাফ দেয়ার পর এখনও তারা শূন্যে, বেকায়দা ভঙ্গিতে নামল। রেইলিং ভেঙে পড়ে যাচ্ছে নিগ্রো, খপ করে সঙ্গীর শার্ট ধরে ফেলায় সে-ও তার পিছু নিল। পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল দু'জন।

ছুটল রানা, অকুস্থলে কেউ পৌঁছবার আগেই কেটে পড়তে হবে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি চালিয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করতে কোন অসুবিধে হলো না। বিশ মিনিট পর গাড়ি থামল ছ'শো ছেষট্টি নম্বর ডোয়ার স্ট্রীটে।

নক করল রানা। দরজা খুলল সেই ম্যাডামই। রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। কবাট বন্ধ করতে যাবে, গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে হলওয়ে হয়ে চলে এল রানা রিসেপশন রুমে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠছে। পিছু নিয়েছে ম্যাডাম, চিৎকার করে পোষা দুই গুণ্ডাকে ডাকছে।

তিনতলার ডান দিকের দরজায় লাথি মারল রানা। কবাট বিস্ফোরিত হলো। লোকটার মাথায় টাক, চড়াও হয়েছে নিগ্রো একটা মেয়ের ওপর। 'ছি-ছি, কি অসভ্য!' চেঁচাল মেয়েটা।

ঘরে ঢুকেও ছুটে বেরিয়ে এল রানা। আরেক লাথিতে পাশের

দরজা ভাঙল। এখানে দুটো চীনা মেয়ে, এক আধবুড়োর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। তিনজনই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 'রেইড নাকি!' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

ঘর থেকে বেরুতেই রানা দেখল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দুই গুণ্ডা। চিৎকার করে কি যেন বলল তারা। তৃতীয় কামরায় ছেলে ও মেয়ে, দু'জনই শ্বেতাঙ্গ। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুণ্ডাদের সামনে পড়ল রানা। প্রথম লোকটা ঘুসি চালাল, ঝট করে কাত হয়ে তার পেটে লাথি মারল ও। লোকটা কুঁজো হয়ে গেল, দ্বিতীয় লাথি খেয়ে আবার সোজা হলো। তার সঙ্গীকে আঙুল বাঁকা করে ডাকল রানা। সিঁড়ির মাথা থেকে ম্যাডাম বলল, 'মাসে মাসে বেতন পাও, বোনাস পাও, অথচ একজন লোককে কাবু করতে পারছ না?'

বোধহয় চাকরির কথা ভেবেই রানাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল লোকটা। রানাকে তেমন কিছুই করতে হলো না, শুধু এক পাশে সরে গিয়ে ঠিক সময়টিতে তার নিতম্বে একটা লাথি মেরে গতিটা বাড়িয়ে দিতে হলো। উড়ে দেয়ালে মাথা দিয়ে পড়ল গুণ্ডা। মেঝেতে পড়ার পর নড়ছে না।

প্রথম গুণ্ডা সিধে হচ্ছে, এক ঘুসিতে তাকেও দেয়ালের ওপর ফেলল রানা, তারপর ছুটল সিঁড়ির দিকে। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার জুড়ে দিল ম্যাডাম, ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গোটা বাড়িতেই চিৎকার চেঁচামেচি, কান্না আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। সিঁড়ির মাঝখানে ম্যাডামের চুল ধরল রানা, ল্যান্ডিঙের একটা দরজা খোলা দেখে ঠেলে ভেতরে ঢোকাল, তারপর চেপে ধরল দেয়ালের গায়ে। 'কোথায় সে?'

ম্যাডাম কেঁদে ফেলল। 'পুলিসকে আমি পয়সা দিই এই জন্যে? ছাড়ো...!'

ঠাস করে চড় মারল রানা। 'নিনা গ্লোরিয়া কোথায়?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে আরেকটা চড় কষল। 'মারতে মারতে

grohon.com

মেরেই ফেলব। কোথায় সে?'

রানার চোখ দেখে এবার সত্যি সত্যি আতঙ্ক অনুভব করল ম্যাডাম। 'যিশুর কিরে, পবিত্র জননী মেরির কসম, আমি জানি না। ওরা এসে প্রচুর টাকা দিয়ে বলল মেয়েটাকে আমি যেন ওই কামরাটা ব্যবহার করতে দিই। বলল, কেউ এসে মেয়েটাকে চাইলে আমাকে শুধু কামরাটা দেখিয়ে দিতে হবে।'

'আমি চলে যাবার পর মেয়েটা কি করল?' ম্যাডামের চুল ধরে ঝাঁকাল রানা।

'দু'জন লোক ওকে এখানে দিয়ে গিয়েছিল, তারাই আবার এসে নিয়ে গেছে।' ঠকঠক করে কাঁপছে ম্যাডাম।

'একজন প্রকাণ্ড? জাপানি কুস্তিগির?'

'না। দু'জনই হালকা-পাতলা।'

'ওদের ঠিকানা বলো।' ম্যাডামের মাথাটা দেয়ালে ঠুকল রানা।

'যিশুর কিরে, পবিত্র মাতা মেরির...'

'তোমার কপাল খারাপ,' বলল রানা, হাতে অ্যাস্ট্রা বেরিয়ে এসেছে। 'সাহায্য করতে পারলে না যখন, মরো।' পিস্তলটা ম্যাডামের পেটে চেপে ধরল।

'দাঁড়াও! থামো!' গাউনের পকেটে হাত ভরল ম্যাডাম। 'গ্লোরিয়ার কোন সমস্যা হলে যোগাযোগ করার জন্যে ওরা আমাকে একটা নম্বর দিয়েছিল, দেখি সেটা আছে কিনা।' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল সে, একবার চোখ বুলিয়ে রানাকে দিল সেটা।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে রানা, পিছন থেকে ম্যাডাম চিৎকার শুরু করল, 'আমার যে ব্যবসার বারোটা বাজল, তার কি হবে? ওই মুখপোড়া বাঁদর, ওই হারামজাদা, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি...'

এগারো

একটা ফোন নম্বরকে ঠিকানায় রূপান্তর করতে হবে। নিউ ইয়র্ক পুলিস ডিপার্টমেন্টে ফোন করল রানা, নিজের পরিচয় দিয়ে কমিশনারকে চাইল। তিনি লাইনে আসতে বলল, 'সিআইএ চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার এখনকার স্ট্যাটাস জেনে নিন, যদি প্রয়োজন মনে করেন। তবে যে ফোন নম্বর এখন আপনাকে দিচ্ছি সেটার ঠিকানা আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে জানাতে হবে।'

'অপারেশন গ্লোবাল ইমার্জেন্সী, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন কমিশনার। 'মি. স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, মি. রানা। দশ মিনিট নয়, পনেরো মিনিট পর আবার ফোন করুন, প্লীজ।' কানেকশন কেটে দিয়ে ফোন বুদের দেয়ালে হেলান দিল রানা। এখনও ভিজে কাপড়ে রয়েছে ও, দেখাচ্ছে যেন একটা কাকতাড়ুয়া।

পনেরো মিনিট পর কমিশনার জানালেন, 'নয় নম্বর অ্যাভিনিউ, একশো ষাট নম্বর বিল্ডিং, অ্যাপার্টমেন্ট সিক্স-সি। আপনার আর কোন সাহায্য লাগবে, মি. রানা?'

'না, ধন্যবাদ।' বুদ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল রানা। নয় নম্বর এভিনিউয়ে ঢোকার মুখে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল, বাকি পথ হেঁটে যাবে।

একশো ষাট নম্বর আধুনিক ও সুরম্য একজোড়া বহুতল ভবনের মাঝখানে বেহাল ও পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা

grohon.com

grohon.com

একটা দালান, সামনের ধাপে আস্তিন গুটানো এক লোক বসে আছে। রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে পাশ কাটাল রানা, তারপর বাঁক ঘুরে চলে এল দালানটার বাম দিকের সুরম্য অট্টালিকার পিছনে। সরু একটা গলি পাওয়া গেল, মুখে মরচে ধরা লোহার গ্রিল বা বেড়া। বেড়া টপকে উল্টোদিকে নামল রানা, ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল দুটো কালো বিড়াল। নিঃশব্দ পায়ে দালানটার পিছনে চলে এল ও, লাফ দিয়ে ফায়ারইস্কেপ-এর নিচের ধাপ বা পাদানি ধরে ঝুলে পড়ল। ঝুলন্ত মই বেয়ে তিনতলা পর্যন্ত উঠল, জানালার সামনে থেমে শুনতে পেল একটা কুকুর ডাকছে। চোরের মত সাবধানে চারতলা পর্যন্ত উঠে এল। এখানে একটা জানালা আংশিক খোলা দেখল। কাঠের কার্নিসটা দু'হাতে ধরল রানা, তারপর মই থেকে পা দুটোও তুলে আনল ওটার ওপর। ভেতর থেকে নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ আসছে। অন্ধকার বেডরুমে নিঃশব্দে নামল রানা।

দেয়াল ঘেঁষা বিছানায় বুড়ো এক লোক ঘুমাচ্ছে। পাশের কামরায় দরজা খুলে ভেতরে কাউকে দেখল না, ওখান থেকে বেরিয়ে হলওয়েতে চলে এল। অ্যাপার্টমেন্ট সিক্স-সি আরও একতলা নিচে। সরু কাঠের সিঁড়ি, মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। হলওয়েতে কোন গার্ড নেই। একটা করে ধাপ টপকে সিঁড়ির নিচে নামল, দেখল সিক্স-সি অ্যাপার্টমেন্টের দরজার নিচটা আলোকিত হয়ে আছে। কামরাটা সেকেন্ড ফ্লোর ল্যান্ডিঙের মাথায়।

অ্যাস্ট্রার ঠাণ্ডা ইস্পাত ওর তালুতে, কান পেতে কামরার ভেতর থেকে আসা ফিসফাস আওয়াজ শুনছে রানা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না—দরজাটা হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করবে, নাকি ছুটে এসে কাঁধের ধাক্কায় কবাট ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। তার আর সময়ও পাওয়া গেল না, গুলির শব্দ হলো। একটাই গুলি, তত জোরাল নয়। সম্ভবত .২২ ক্যালিবার পিস্তল।

কাঁধের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। ঘরের মেঝেতে দুই হাঁটু দিয়ে পড়ল রানা, সেজদার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে শিরদাঁড়া। দু'জন লোককে পাশের কামরায় অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ও, ফায়ার ইস্কেপ ধরে পালাবে। নীল রোব পরা গ্লোরিয়া মেঝেতে পড়ে আছে। সে নড়ছে না, নড়বেও না—দায়ী কপালের মাঝখানে ছোট্ট ও নিখুঁত ফুটোটা। পাশের কামরায় চলে যাওয়া লোকগুলোর মধ্যে একজন নিগ্রো, আরেকজন শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গটা সম্ভবত রাশিয়ান। তবে দোরগোড়ায় ফিরে এল নিগ্রোটা, হাতে পিস্তল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বলে রেখেছিল লোকটা ফিরে আসবে, দরজায় তাক করা পিস্তলের ট্রিগারটা শুধু টেনে দিল রানা। লোকটার ভাল করে ফেরা হয়নি, তার আগেই বুলেটের ধাক্কায় পড়ে গেল পিছনদিকে।

শরীরটা মোচড় খাচ্ছে, সেটাকে টপকে পাশের ঘরে ঢুকল রানা। রাশিয়ান খুনীর একটা পা জানালার কার্নিসে উঠে গেছে। এক হাতে চকচকে পিস্তল।

'থামো! নড়বে না!' অ্যাস্ট্রা তাক করে গুলি করার ভয় দেখাল রানা, যদিও লোকটাকে বন্দী করাই ওর উদ্দেশ্য। স্থির হয়ে গেল সে, হাতের পিস্তল মেঝের দিকে তাক করা, একটা পা জানালার বাইরে, আরেক পা ভেতরে। 'শুধু হাতের ওটা ফেলে দাও।'

দীর্ঘ ও নিস্তব্ধ একটা মুহূর্ত পার হয়ে যাচ্ছে। লোকটা এক চুল নড়ছে না, কথা বলছে না, বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে, শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রানার দিকে। তারপর, রানাকে হতচকিত করে দিয়ে, এক ঝটকায় পিস্তল তুলে গুলি করল সে, স্রেফ উড়িয়ে দিল নিজের মগজ।

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা, জ্যাকেটের পকেটে পিস্তল গুঁজে ফিরে এল লিভিংরুমে। গ্লোরিয়া শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, হাতের পাশে ছড়িয়ে রয়েছে একশো ডলারের আট-দশটা নোট। রানার হাতে তিন তিনটা লাশ অথচ প্রয়োজনীয় কোন তথ্য নেই। তবে মারা

grohon.com

গেলেও লোক দু'জন একটা কথা বলে গেছে। তারা প্রফেশনাল, নিবেদিতপ্রাণ, নিজেদের বসকে যেমন মান্য করে তেমনি যমের মত ভয়ও পায়। রাশিয়ান লোকটা জেরার মুখে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যাটাকেই শ্রেয় বলে ধরে নিয়েছে বিনা কারণে নয়।

ল্যাম্পের পাশে টেবিলে পড়ে রয়েছে গ্লোরিয়ার পার্স। টেবিলের ওপর সেটা খালি করল রানা। চুলের কাঁটা, লিপস্টিক, খুচরো পয়সা, রুমাল ও একজোড়া নোজ প্লাগ দেখল রানা। আপনমনে মাথা নাড়ল। এ-সব থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে, সাইরেন বাজিয়ে পুলিস কার ছুটে আসার শব্দ পেল। দালানের সামনে এসে দেখল আস্তিন গুটানো লোকটা কেটে পড়েছে। রাস্তা পার হয়ে পার্কে ঢুকল রানা, একটা বেঞ্চে বসে কি ঘটল চিন্তা করছে। গোটা ব্যাপারটাই ছিল ওকে খুন করার জন্যে পাতা একটা ফাঁদ। গ্লোরিয়ার নাম ও ঠিকানা উপযাচক হয়ে যোগান দিয়েছে বেনিন। এই হলো তার সহযোগিতার নমুনা!

পার্ক থেকে বেরিয়ে প্রথমে কাছাকাছি থানায় ফোন করল রানা। নিজের পরিচয় না দিয়ে শুধু জানাল ডোয়ার স্ট্রীটের মোড়ে একটা পরিত্যক্ত গাড়ি পড়ে আছে। তারপর সিআইএ চীফ জন স্যান্ডফোর্ডের দেয়া নম্বরে ডায়াল করল। রাত শেষ হতে চলেছে, তবু মাত্র দু'বার রিঙ হতেই রিসিভার তুললেন তিনি। কি ঘটেছে শোনার পর রানার সঙ্গে একমত হলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে রুশ ইন্টেলিজেন্স আপনাকে টার্গেট করেছে। মি. রানা, আরও কি ঘটেছে শুনবেন? এই একটু আগে ওয়ার্ল্ড লীডারশিপ কনফারেন্স থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মি. পুতিন।'

'বলেন কি!' রানা বিমূঢ়। 'কাল উদ্বোধন আর আজ ওরা বলছে আসবে না?'

'ওদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে বলছে অংশগ্রহণের জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার তা তাদের নেই,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'এ স্রেফ খোঁড়া একটা অজুহাত, মি. রানা। এরমধ্যে গূঢ় কোন রহস্য আছে।'

'ভাইরাসের ব্যাপারে কিছু বলছে? বেনিন?'

'অপেক্ষা করছিলাম, কখন আপনি প্রশ্নটা করেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সিআইএ চীফ। 'আমার কাউন্টার পার্ট, মানে, আপনার বস্, জেনারেল রাহাত খান আমার শ্রদ্ধাভাজনদের তালিকায় উঠে এসেছেন। তাঁর অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা একশো ভাগ সত্যি প্রমাণিত হলো। বেনিন ফ্যাক্স করে খানিক আগে জানিয়েছে, চাঙকুফেঙের কাছাকাছি X-99 খুঁজে পেয়েছে তারা। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'কিন্তু বলছে, ওরা মনে করছে এরকম একটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস ওদের কাছে থাকাই সবদিক থেকে নিরাপদ, বিশেষ করে আমরা যখন একবার ওটা সামলে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। অর্থাৎ জেনারেল ঠিক যেমন ধারণা করেছিলেন, তাই ঘটছে।'

'বেনিনের এই রিপোর্ট আপনি বিশ্বাস করছেন? সত্যি ওরা ভাইরাসটা পেয়েছে?'

সিআইএ চীফ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি ধারণা?'

'যে জিনিস হারায়নি, সেটা খুঁজে পাবার প্রশ্ন ওঠে না,' বলল রানা।

'জেনারেলও তাই বলছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত,' জানালেন স্যান্ডফোর্ড। 'অর্থাৎ বিপদ কমে তো নি-ই, বরং আরও বেড়েছে।'

'চীফ কি ঘুমাচ্ছেন?' জানতে চাইল রানা।

'এইমাত্র তাঁকে আমি জোর করে গেস্টরুমে দিয়ে এসেছি। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট আমাদের, একটু না ঘুমালে কি করে হয়...'

'আপনারও তো বিশ্রাম দরকার।'

'হ্যাঁ, দরকার, কিন্তু হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন পাঁচ-সাত মিনিট পরপর ফোন করে জাগিয়ে রেখেছে আমাকে।'

'মি. স্যান্ডফোর্ড, টীম লীডার হিসেবে আমি একটা জরুরী মীটিং ডাকতে চাই। বেনিন আর ঝাং ঝিয়াং কোথায়, তারা মীটিঙে আসবে কিনা আমি জানি না—না এলে বাকি সবাইকে নিয়ে বসব।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা করা যাবে...'

'আপনাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি, এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস, ফেডারেল পুলিস, নিউ ইয়র্ক পুলিস—সবাইকে প্রতিনিধি পাঠাতে বলুন। জাতিসংঘের বিশেষ সিকিউরিটি ফোর্সও যেন বাদ না যায়। সম্ভব তো?'

'অবশ্যই সম্ভব। মীটিংটা ঠিক কখন চান আপনি?' জানতে চাইলেন স্যান্ডফোর্ড।

'সকাল দশটায়। মি. স্যান্ডফোর্ড, বসকে বলবেন, আমি চাই তিনিও যেন মীটিঙে থাকেন। আর আপনি তো সভাপতিত্বই করবেন।'

'...ভেরি গুড।'

কোন ঝুঁকি না নিয়ে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার একটা সেফ হাউসে রাত কাটাল ও। তবে সেফ হাউসে ঢোকার আগে ওয়াশিংটনের হিলটন ইন্টারন্যাশনালে একটা ফোন করতে ভুলল না। বিদায় না নিয়ে চলে আসায় দুঃখ প্রকাশ করল রানা, উত্তরে ইভা শুধু বলল, 'আমার তো আর সে অধিকার নেই যে তোমার ওপর অভিমান করব। তবে একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি ঋণের কিছুটা পরিশোধ করার যে সুযোগ পাব বলে আশা করেছিলাম সেটা আমি পাচ্ছি না।'

'বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে,' কথা দিল রানা। 'এটা তোমার ভুল ধারণা যে পাওনা আদায় করার ইচ্ছেটা আমার উবে গেছে।'

'হাসপাতালে গিয়েছিলাম,' বলল ইভা। 'মামার অবস্থা ভাল নয়। ও, একটা কথা, কারা যেন আমাকে পাহারা দিচ্ছে। তুমি জানো কারা?'

'ওরা রানা এজেন্সির লোক,' বলল রানা। 'না, তোমার কোন বিপদ হবে বলে মনে করি না, স্রেফ একটু সাবধান হওয়া আর কি। ড. ডিউইটের ভাল মন্দ যাই ঘটুক, তুমি কিন্তু হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেয়ো না।'

'কিন্তু তুমি যদি না আসো?'

'তখন তোমার যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, আমার লোকজনকে বললেই হবে।'

'তোমার জন্যে আমার বোধহয় প্রার্থনা করা দরকার, তাই না?' কোন কারণ ছাড়াই ইভার গলাটা বুজে এল।

'আমার জন্যে আলাদাভাবে প্রার্থনা না করলেও চলবে,' বলল রানা। 'তুমি বরং দুনিয়ার সবার জন্যে প্রার্থনা করো।' যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

দেরি করে শুতে গেলেও ঘুম ভাঙল পাঁচ ঘণ্টা পর, সকাল ন'টায়। শাওয়ার, শেভ, ব্রেকফাস্ট সেরে নয়টা চল্লিশে সেফ হাউস থেকে বেরুল। নিউ ইয়র্কের সিআইএ অফিসে পৌঁছাল মীটিং শুরু হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে।

টীমের দু'জন সদস্য, সিআইএ এজেন্ট, ডেভিড ও লিংকন, অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ওরা কনফারেন্স হলের দিকে যাচ্ছে না দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। প্রশ্ন করেও সদুত্তর পাওয়া গেল না, লিংকন শুধু বলল, 'দুই গুরু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, বললেন তুমি এলেই যেন তাঁদের কাছে নিয়ে যাই।'

সেই পুরানো দৃশ্যটাই আরেকবার দেখতে পেল রানা।

grohon.com

সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ডের অফিস কামরায় উদ্বিগ্ন রাহাত খান পায়চারি করছেন, নাক-মুখ থেকে প্রাচীন রেলগাড়ির এঞ্জিনের মত গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্যান্ডফোর্ড দাঁড়িয়ে আছেন ডেস্কের পিছনে খোলা একটা জানালার সামনে, তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে মাইলখানেক দূরে আকাশ ছোঁয়া জাতিসংঘ ভবনের দিকে।

'মীটিংটা বাতিল করা হয়েছে, রানা,' ওকে দেখেই বললেন রাহাত খান।

'কেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাইরাসটা পাওয়া গেছে, এবং সেই সঙ্গে বিপদটাও কেটে গেছে, রুশ ইন্টেলিজেন্সের এই বক্তব্য আমরা মেনে নিয়েছি, এটা বোঝাবার জন্যে,' বললেন রাহাত খান। 'আমাদেরকে বোকা বানাতে পেরেছে ভেবে ওরা নিশ্চিত হোক, এটাই আমরা চাই। তাতে ওরা একটু হলেও কম সতর্ক থাকবে, এবং দু'একটা ভুলও করতে পারে। মীটিঙে বসে আমাদের মূল উদ্বেগ চেপে রাখা সম্ভব নয়। তারপর কার মুখ থেকে কি ফাঁস হয়ে যাবে কে বলবে। এ-সব চিন্তা করেই মীটিংটা বাতিল করে দিলাম।'

জানালার দিকে পিছন ফিরলেন স্যান্ডফোর্ড। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো রাহাত খান আরও কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

'বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, বৈঠক চলার সময় জাতিসংঘ ভবনের নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয়ে মি. স্যান্ডফোর্ড তোমাকে একটা ধারণা দেবেন,' বললেন বিসিআই চীফ। 'তার আগে অন্য একটা বিষয় ব্যাখ্যা করব আমি, তা না হলে পরিস্থিতিটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে না।

'রুশ নেতারা গোলটেবিল বৈঠকে আসছেন না, এ থেকেই প্রমাণ হয় তাঁরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নন। বিশেষ করে মি. পুতিনের আসবেন না বলায় এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। পুতিন এলেন না, সভা শুরু হলো, এবং সেই সভায় উপস্থিত সবাই

ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দশ মিনিটের মধ্যে অসহ্য কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন—এরকম যদি ঘটে, দুনিয়ার মানুষ কি ভাববে?'

'ভাববে রাশিয়া দায়ী।'

'তারপর কি ঘটবে?'

চিন্তা না করেই জবাব দিচ্ছে রানা। 'দুনিয়ার প্রতিটি দেশ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে। দুনিয়ার বুক থেকে রাশিয়ার নাম মুছে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।'

'তাহলে বলো, মি. পুতিন এরকম একটা বোকামি কেন করতে যাচ্ছেন?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। নিজেই উত্তর দিলেন তিনি, 'উত্তর হলো, এ-ব্যাপারে মি. পুতিন এবং তাঁর সরকার কিছুই জানেন না। গোটা ব্যাপারটা আসলে রুশ ইন্টেলিজেন্সের একটা গ্রুপ আর কবীর চৌধুরীর চাল ও চক্রান্ত।

'হোয়াইট হাউস থেকে ক্রেমলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মি. পুতিন আভাস দিয়ে বলেছেন, রুশ ইন্টেলিজেন্স তাঁকে বুঝিয়েছে চেচেন বিদ্রোহীরা মস্কোয় বড় ধরনের স্যাবটাজ করার প্ল্যান করেছে, প্ল্যানটা কাজে লাগানো হবে তিনি দেশ ত্যাগ করার পর। এই রিপোর্ট পাবার পরই নিউ ইয়র্ক সফর বাতিল করেছেন তিনি। তিনি কি ভাইরাসের ভয়ে আসছেন না, এরকম একটা প্রশ্ন শুনে মি. পুতিন অবাক হয়েছেন, বলেছেন, ভাইরাস তো পাওয়াই গেছে, কাজেই ভয় পাবার প্রশ্ন উঠছে কেন!'

রানা বলল, 'এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে নিউ ইয়র্কে যদি খুন করা সম্ভব হয়, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, তারই সুযোগ নিয়ে সাবেক কেজিবি অফিসাররা রাশিয়ায় একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় বসাবে। মি. পুতিনকে আসতে দিচ্ছে না, সম্ভবত গ্রেফতার করে বিচারের নামে প্রতিশোধ নিতে চায়।'

'হয়তো। তবে আমার ধারণা, পাইকারী হত্যাকাণ্ডটা যদি

grohon.com

grohon.com

ঘটাতে পারে, ওরা মি. পুতিনকে দায়ী বলে ঘোষণা করবে।' রাহাত খান স্যান্ডফোর্ডের দিকে তাকালেন। 'এবার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে বলুন আপনি।'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে, স্যার,' বলল রানা। 'এই গোলটেবিল বৈঠক কি স্থগিত করার কোন উপায়ই নেই?'

'কাল সকালে যেখানে উদ্বোধন? অসম্ভব!' মাথা নাড়লেন স্যান্ডফোর্ড। 'তাছাড়া যুক্তিটা কি? আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। আছে শুধু একটা থিওরি, সে থিওরি যতই জোরাল হোক, বেশিরভাগ রাষ্ট্রপ্রধানই শুনে হাসবেন বা বিরক্তি বোধ করবেন। আর সবাই আমেরিকাকে গাল দেবে, বলবে দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো এক হোক আমেরিকা তা চায় না। উঁহুঁ, মি. রানা, এখন আর চাকা থামাবার কোন উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা চুপ করে থাকল।

এরপর সিকিউরিটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করলেন সিআইএ চীফ। তাঁর কণ্ঠস্বর খানিকটা যান্ত্রিক, খানিকটা একঘেয়ে লাগল রানার কানে। মনে খটকা লাগল কথাগুলো উনি আসলে কাকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন? রানাকে, নাকি নিজেকেই?

'ওরা সফল হতে পারবে না, মি. রানা। আমার তো ধারণা, সিকিউরিটির কড়াকড়ি দেখে ওরা আসতেই সাহস পাবে না। এলেও সিকিউরিটি কর্ডন ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কর্ডনের পর কর্ডন, ক'টাকে ফাঁকি দেবে?'

নিজের অ্যাটাশেই কেস খুলে জাতিসংঘ ভবন এলাকার একটা ম্যাপ বের করলেন তিনি। 'জাতিসংঘ ভবনের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদেরকে চেক করবে সিআইএ, এফবিআই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি, সিক্রেট এজেন্ট, ফেডারেল ও রাজ্য পুলিস এবং জাতিসংঘের নিজস্ব ইন্টারনাল সিকিউরিটি সংস্থার দু'হাজার সদস্য। ভেতরে সিআইএ ও এফবিআইকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ভবনের সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে তারা। অ্যাসেম্বলি হল-

এর সিকিউরিটি এফবিআই ও ট্রেজারি এজেন্টদের। সব মিলিয়ে জাতিসংঘে ঢোকার সাতটা পথ, প্রতিটি লোককে চারবার করে চেক করা হবে, খালি হাতে, মেটাল ডিটেকটর ও ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে। তারপরও ভেতরে যদি কেউ ঢুকতে পারে, সন্দেহ হওয়া মাত্র চেক করা হবে তাকে।

'আমার ধারণা, কিয়াংশি আসবে না। কারণ তার ছয়শো পাউন্ডই তো একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। যদি আসে তো রুশ ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্টদের কেউ আসবে...'

রানা মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করল। 'আমার ধারণা কবীর চৌধুরী নিজে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আপনিই তাকে প্রথমে চিনতে পারবেন,' বললেন স্যান্ডফোর্ড। 'আমরা তার অনেক ফটো সংগ্রহ করেছি, কিন্তু জেনারেল বলছেন এগুলোর কোনটাতেই নাকি তার আসল চেহারা নেই। সে নাকি বামুন, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, ম্যানিকিন, কাঠের মূর্তি, এমনকি পাথুরে পিলারও সাজতে পারে।

'স্টাফ ও ভিজিটর, প্রত্যেকের জন্যে আইডেনটিটি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এই কার্ড গত তিন দিনে তিনবার বদলেছি আমরা। আজ সকালে সবগুলো বাতিল করে নতুন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এই কার্ড সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা, নকল করা সম্ভব নয়। যার কাছে এই কার্ড নেই, জাতিসংঘ ভবনের এক মাইলের মধ্যে ঢুকতে পারবে না সে। কেউই তার কার্ড পকেটে রাখতে পারবে না। হয় কাঁধে, নয়তো বুকে আটকে রাখতে হবে। প্রতিটি কার্ডে বহনকারীর ফটো থাকবে।

'জাতিসংঘ ভবনের সমস্ত কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে, তাদের সবাইকে আজই ভেতরে ঢোকানো হবে। ঢোকার পর তাদেরকে আর বেরুতে দেয়া হবে না। এতে করে সিকিউরিটি এজেন্সির কাজ অনেক কমে যাবে। তাদেরকে শুধু ডেলিগেট আর তাদের সঙ্গে আসা লোকজনদের চেক করতে হবে।

'ইস্ট রিভারে নৌ-বাহিনীর গান বোট সারাক্ষণ টহল দিচ্ছে। সঙ্গে আছে কোস্টগার্ড পেট্রল বোট। ফার্স্ট এভিনিউ, ফরটি-সেকেন্ড স্ট্রীট আর ফরটি এইটথ্ স্ট্রীটে সিআইএ আর এফবিআই-এর এজেন্টরা সাদা পোশাকে গিজগিজ করছে। মি. রানা, আমাদের সাধ্যমত যা করার সবই আমরা করেছি। ওদেরকে এমনকি এতটা কাছেও আসতে দেয়া হবে না যাতে রকেট ছুঁড়ে ভাইরাস ভর্তি ফাইলটা অ্যাসেম্বলি হলে ফাটাতে পারে।'

রানা কোন মন্তব্য না করে শুনে যাচ্ছে।

'দেখতে পাচ্ছি, এত কিছুর পরও আপনি সন্তুষ্ট নন, মি. রানা।' স্যান্ডফোর্ডকে শুধু বিস্মিত নয়, খানিকটা উদ্বিগ্নও দেখাল। 'তবে আমার ধারণা, ওরা আসবেই না। আর যদি আসেও, কোনভাবেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আপনি ইচ্ছে করলে আজ রাতে একবার সিকিউরিটি সিস্টেমটা চেক করে দেখতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।'

'আইডি কার্ডটা থাকলেও ঢুকতে পারব না?'

'তা পারবেন। তবে ওই কার্ড ওরা তো পাচ্ছে না।'

'ওরা আসবে, মি. স্যান্ডফোর্ড,' শান্ত, গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'অন্তত কবীর চৌধুরী তো আসবেই। আমার ধারণা, কিয়াংশিও আসবে। তার শরীর একটা সাইনবোর্ড, এটা কবীর চৌধুরীও জানে। এটাকে বরং একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে সে। তাকে আমি চিনি। যদি মনে করে কিয়াংশিকে দরকার, অবশ্যই তাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

সিআইএ চীফ রানার দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে দিলেন। 'এতে আপনার ইনার সিকিউরিটি ক্লিয়্যারান্স পেপার আছে-যেখানে খুশি আসা-যাওয়া করতে পারবেন, যাকে খুশি সার্চ বা অ্যারেস্ট করতে পারবেন।'

'ড. ডিউইট কথা বলবেন, এরকম কোন সম্ভাবনাই নেই?'

জিজ্ঞেস করল রানা, এনভেলাপ খুলে কার্ড, ব্যাজ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র পরীক্ষা করছে।

স্যান্ডফোর্ড মাথা নাড়লেন। 'তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। পালস ও হার্টবিট স্লো হয়ে গেছে।'

'কাল ক'টার সময় কনফারেন্স শুরু?'

'কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন নেলসন ম্যান্ডেলা। তার আগে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করবেন খ্রিস্টানদের তরফ থেকে পোপ, মুসলমানদের তরফ থেকে সৌদি আরবের একজন খতিব, অন্যান্য ধর্মের একজন করে প্রধান ধর্মগুরু। প্রত্যেকের জন্যে দু'মিনিট করে সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপরই ভাষণ দেবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

রাহাত খান বললেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তালিকার এগারো নম্বরে, কিন্তু মি. পুতিন যেহেতু আসছেন না, দশ নম্বর, অর্থাৎ ঈজিপ্টের পরই ডায়াসে আসছেন তিনি।'

'তাঁর জন্যে বিশেষ কোন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্যার?'

'বিসিআই থেকে সোহেলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে,' জানালেন রাহাত খান। 'সোহেলের সঙ্গে পাঁচজন এজেন্ট আছে।' বাদাম আকৃতির ছোট্ট একটা যন্ত্র দেখা গেল তাঁর হাতে, রানার হাতে গুঁজে দিলেন। 'এই সেনসরটা সঙ্গে রাখো। এটার সাহায্যে তুমি কোন মেসেজ পাঠাতে পারবে না বা মেসেজ রিসিভও করতে পারবে না, আমরা শুধু মনিটর দেখে জানতে পারব কোথায় আছ তুমি।'

সেনসরটা ট্রাউজারের পকেটে রাখল রানা।

'আজকের দিনটা তুমি বিশ্রাম নাও,' রানাকে বললেন রা 'তবে সময় করে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট সরেজমিনে একবার চেক কোরো।'

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিআইএ অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা।

grohon.com

grohon.com

বারো

সারা দুনিয়ায় একশোরও বেশি রাষ্ট্রকে নেতৃত্বহীন করার রোমহর্ষক আশঙ্কা নিয়ে ভোর হলো নিউ ইয়র্ক শহরে। শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে, পরপর দু'কাপ কড়া কফি খেয়ে রানা যখন এজেন্সির সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে এল, অন্ধকার ও কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। ফার্স্ট এভিনিউ ধরে জাতিসংঘ ভবনের দিকে হাঁটা ধরল ও। পাঁচ পা-ও এগোতে পারেনি, বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেন্সির ছ'জন এজেন্ট ছেঁকে ধরল ওকে। মূল ভবনে ঢোকার আগে সতেরোবার থামানো হলো ওকে। কাল ও আজকের অভিজ্ঞতা একই কথা বলে, সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টে কোন খুঁত নেই। খুঁত যদি থাকে তো সে রানার মনে। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, কামবারল্যান্ড রিপজিটরিতেও সিকিউরিটি খুব কড়া ছিল, কিন্তু তারপরও সেটা কোন কাজে আসেনি–বিন্দুমাত্র না।

ঘড়িতে সময় দেখল রানা। ছ'টা। আর চার ঘণ্টা পর বহু প্রতীক্ষিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শুভ সূচনা ঘটতে যাচ্ছে। কিংবা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। ধীর, প্রায় অলস পায়ে, গোটা জাতিসংঘ ভবন এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ও। মাঝেমধ্যে কোন দেয়াল বা পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনও বা সিঁড়ি বেয়ে এক ফ্লোর থেকে আরেক ফ্লোরে ওঠা-নামা করছে।

একসময় লোক সমাগম শুরু হলো। এখনও রানা তল্লাশী চালাচ্ছে, এদিক ওদিক চেক করছে। লোকজনদের মধ্যে রেগুলার

ইউএন ডেলিগেটরা রয়েছেন, স্পেশাল ডেলিগেটরা রয়েছেন, রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সাংবাদিক, ফটো জার্নালিস্ট, টিভি ও রেডিও জার্নালিস্ট, বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক, রাষ্ট্রপ্রধানদের সহকারী; ইউনিফর্ম পরা টেকনিশিয়ান, মেকানিক, ঝাড়ুদার, ডাক্তার, নার্স, ক্যাটারার, ইলেকট্রিশিয়ান। প্রতিটি কর্ডনে চেক করা হচ্ছে সবাইকে। একই কর্ডনে প্রয়োজনে কয়েকবার। সবগুলো কর্ডন পার হয়ে আসার পরও রেহাই নেই, সাদা পোশাক পরা টহল পুলিসদের ডাকে থামতে হচ্ছে। এক এক করে সাতটা প্রবেশ পথই ঘুরে এল রানা। কোথাও কোন রকম গাফিলতি বা ঢিলেঢালা ভাব চোখে পড়ল না। সাত নম্বর প্রবেশ পথে স্বয়ং সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ডকে পকেটে হাত ভরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। চোখাচোখি হলো, তবে দু'জনের কেউই হাসল না।

'এই গেট দিয়ে আজ সকালে কতজন ভেতরে ঢুকবে?' সিআইএ এজেন্ট লিংকনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দিল একজন পুলিস ক্যাপটেন, হাতের লম্বা একটা তালিকায় চোখ রেখে। 'মিডিয়ার লোকজন, গেস্ট আর ডেলিগেটরা বাদে হাতে গোনা কয়েকজন মেকানিক ও টেকনিশিয়ান। সাপ্লাই নিয়ে একটা ব্যাংকুইট আউটফিটের কিছু লোকজনও ঢুকবে–সাপ্লাই মানে, টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন ইত্যাদি সহ ডিনারের জন্যে তৈজস-পত্র। একটা মাত্র কাভার্ড ভ্যান।'

'সবাইকে ভালমত চেক করা চাই, কেমন?' কার্ডের ফটো মিলিয়ে তারপর ঢুকতে দেবেন।'

'কয়েকবার করে চেক করা হবে, স্যার।'

'কামবারল্যান্ডেও সবার কার্ডে ফটো ছিল,' বিড় বিড় করল রানা।

স্যান্ডফোর্ড চোখ মিটমিট করলেন। 'কিন্তু কামবারল্যান্ডে বহিরাগত কেউ অনুপ্রবেশ করেনি, মি. রানা,' শান্ত গলায় বললেন

তিনি। 'ড. ডিউইট নিজেদের মানুষ ছিলেন, বিশ্বস্ত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওখান থেকে সরে এল রানা। জাতিসংঘ ভবনের কোন কর্মচারীকে কবীর চৌধুরী কাজে লাগাচ্ছে না তো? গত কাল বা গত পরশু ভাইরাসটা ভবনের ভেতরে ঢোকানো হয়ে থাকলে? সেক্ষেত্রে সিকিউরিটির এত ব্যাপক আয়োজন কোন কাজেই আসবে না, স্রেফ একটা প্রহসনে পরিণত হবে। তবে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা। কারণ ওই আশঙ্কাকে সত্যি ধরে নিলে সেফ হাউসে বা কোন হোটেলে ফিরে গিয়ে সব ভুলে যেতে হয়। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার নিয়মিত কর্মচারীকে জেরা করা বা সার্চ করা সম্ভব নয়।

ঘড়ি দেখল। ন'টা। ওয়াল্টার রীড হসপিটালে ফোন করে ড. ডিউইটের খবর জানতে চাইল রানা। এখনও তিনি কোমায়, হার্টবিট আরও দুর্বল হয়ে আসছে। রিসিভার রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এল। চারদিকের এত ভিড়, এত শব্দ, সব পিছনে ফেলে পালাতে ইচ্ছে করছে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছে ও।

মেইন ফ্লোরে থামতে হলো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলেন। সোহেলকে দেখতে পেল রানা, প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পিছনে পজিশন নিয়েছে। এজেন্টদের সবাইকে চিনতে পারল, সবাই তারা ওর অতি পরিচিতম কেউ বা বন্ধু, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার। কোফি আনান হ্যান্ডশেক করতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। প্রধানমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত সালামের জবাব দিলেন মাথা ঝাঁকিয়ে। সোহেলের পিছনে তাকাল রানা। ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডদের মিছিলই বলতে হবে ভিড়টাকে। গেট দিয়ে এই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকছেন ইংল্যান্ডের রানী। তারপরই এলেন চীনা প্রেসিডেন্ট, তার আশপাশে ঝাং ঝিয়াংকেও দু'একবার দেখা গেল।

চারদিকে সিকিউরিটি এজেন্টদের ভিড় ও তৎপরতা রানার মনে খানিকটা স্বস্তির ভাব এনে দিল। কবীর চৌধুরী যতই বুদ্ধিমান হোক,

এতসব বাধা টপকে অ্যাসেম্বলি হলে ভাইরাসের ফাইলটা সে নিয়ে যেতে পারবে না। সিআইএ চীফের ধারণা হয়তো ঠিক, কবীর চৌধুরী বা কিয়াংশি সম্ভবত আসবেই না। কি যেন তখন বললেন তিনি? '...ওদেরকে এমনকি এতটা কাছেও আসতে দেয়া হবে না যাতে রকেট ছুঁড়ে ভাইরাস ভর্তি ফাইলটা অ্যাসেম্বলি হলে ফাটাতে পারে।' মন্তব্যটা রানার মাথার ভেতর যেন ঝুলে ছিল, ঝুলে ছিল আরেকবার পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে। এবং হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা। অ্যাসেম্বলি হলে ঢোকার হয়তো প্রয়োজনই হবে না কবীর চৌধুরীর, এমনকি সে হয়তো রকেট ব্যবহার করার কথাও ভাবছে না। একই কাজ করবে, এরকম কিছু একটা পেলেই তো চলে। X-99 ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওকে যা বলা হয়েছে, স্মরণ করল রানা। এই ভাইরাস আর সব ভাইরাসের মত নয়, ছড়াবার জন্যে স্পর্শ বা ছোঁয়াছুঁয়ির কোন প্রয়োজন নেই—বাতাসে ছেড়ে দিলেই হবে, শতকরা একশো ভাগ কাজ করবে। অ্যাসেম্বলি হলে বাতাস তো ঢুকছেই। সেই বাতাসকে তো আর চেক করার ব্যবস্থা করা হয়নি। কবীর চৌধুরী এখন যদি সেই বাতাসে ভাইরাসটা ছেড়ে দেয়, কার সাধ্য ঠেকায় ম্যাসাকার?

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা। চারটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ি ভাঙল রানা, সারি সারি অফিস সহ প্রথম বেযমেন্টকে পাশ কাটাল, আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি পেরিয়ে পাশ কাটাল দ্বিতীয়টাকেও, তারপর তৃতীয় বেযমেন্টে নেমে থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। সরু করিডরে পাইপের লম্বা সারি। অনেকগুলো করিডর, গুনে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে লম্বা হলওয়ের দিকে তাকাল রানা। ইউনিফর্ম পরা দুই তরুণী মেঝে পরিষ্কার করছে, দু'জনের হাতেই লম্বা হাতলের মাথায় বুরুশ, কাছেই একটা বড় বালতিতে ডেটল মেশানো পানি। আরও সামনে একজন মেইনটিনান্স স্টাফকে দেখা যাচ্ছে। ছুটতে শুরু করে তাকে ডাকল রানা। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল, রানার ছুটে আসা তাকিয়ে দেখছে।

grohon.com

grohon.com

তেরো

মেইনটেন্যান্স কর্মীর কার্ড দেখতে চাইল রানা। কার্ডটা পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা কোনদিকে, যেটা অ্যাসেম্বলি হলের দিকে গেছে?'

'করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নেবেন, স্যার,' বলল লোকটা। 'বাঁক ঘুরলেই ডাক্টগুলো দেখতে পাবেন। জাল দিয়ে ঘেরা, মোট চারটে–দুটো ওপরে, দুটো নিচে। কেন, স্যার, কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে?'

'দিতেও পারে,' বলে ছুটল রানা। করিডরের শেষ মাথায় বাঁক ঘোরার সময় সামান্য হড়কে গেল, যদিও এদিকটায় এখনও ভেজা বুরুশের ছোঁয়া লাগেনি। ডাক্টগুলো দেখতে পেল রানা। জাল বা স্ক্রীন জায়গা মতই লাগানো রয়েছে। উফ্, যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ডাক্টগুলোর নিচে একটা মেটাল সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। লেখাটা পড়ল রানা।

'অ্যাসেম্বলি হল ভেন্ট সিস্টেম। ব্লোয়ার কন্ট্রোলস ইন বয়লার রূম থ্রী।'

পরমুহূর্তে কে যেন রানার হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল। ভয় হলো, হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। চোখের দৃষ্টি এখনও মেটাল সাইনবোর্ডের গায়ে আঠার মত সেঁটে আছে। ধাতব অক্ষরগুলোর পাশে হলুদ চক দিয়ে আরও একটা কথা লেখা রয়েছে ওখানে, স্পষ্ট বাংলায়: 'আমি পৌঁছে গেছি। পারলে ঠেকাও। ক. চৌ.।'

এক পাশে বাঁক, আরেক পাশে ফাঁকা করিডর। ছুটে বাঁকের

কাছে ফিরে এল রানা। দূরে দুই তরুণীকে এখনও দেখা যাচ্ছে, মেঝেতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে ধীরে ধীরে এদিকেই আসছে। কিন্তু মেইনটেন্যান্স-এর লোকটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তারপর তাকে দেখতে পেল রানা: একটা মই বেয়ে উঠে গেছে দেয়ালের অনেকটা ওপরে, একটা পাইপ খুলে ইলেকট্রিকাল তার জোড়া লাগাচ্ছে।

ছুটল রানা, হাতে ল্যুগার বেরিয়ে এল। 'নামো তুমি! সাবধান, হাত দুটো যেন দেখতে পাই আমি!'

'স্যার!'

'কোন কথা নয়,' গর্জে উঠল রানা। 'নেমে এসো!'

'জ্বী, স্যার, নামছি।' ভয়ে শুকিয়ে গেছে লোকটার মুখ।

কাঁপা কাঁপা পায়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে এল সে। দ্রুত তাকে সার্চ করল রানা। বুকে সাঁটা কার্ডের ফটোর সঙ্গে মুখটা ভাল করে আরেকবার মেলাল। অসম্ভব, এ লোক ছদ্মবেশী কবীর চৌধুরী হতে পারে না। কবীর চৌধুরী না হোক, তার সহযোগী? 'ওপরে তুমি কি করছিলে?'

'রুটিন ওঅর্ক, স্যার,' বলল লোকটা। 'পাইপের ভেতর ইঁদুর ঢুকে তার কাটে তো, প্রতি হপ্তায় খুঁজে বের করে জোড়া লাগাই।'

'চলো, দেখব আমি,' বলল রানা। 'আমার আগে আগে ওঠো।' লোকটার শিরদাঁড়ায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখে মই বেয়ে উঠল রানা। পাইপের কাছে এসে দেখল, লোকটা মিথ্যে কথা বলেনি, সত্যি ছেঁড়া তার জোড়া লাগাচ্ছিল সে। তবু একশো ভাগ নিশ্চিত হবার জন্যে লোকটার চিবুকে চিমটি কাটল রানা। ব্যথায় কাতরে উঠল লোকটা। না, চামড়াই, রাবার নয়।

নিচে পৌঁছে গেছে দুই তরুণী। তাদের মধ্যে একজন নিগ্রো, অপরজন শ্বেতাঙ্গিনী। দু'জনই বেশ মোটাসোটা আর লম্বা। 'এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ? কোন কুস্তিগির বা অন্য কোন লোককে?' মই বেয়ে নামার সময় জিজ্ঞেস করল ও।

তরুণীরা পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর একযোগে মাথা ঝাঁকাল। রানা খেয়াল করল দুজনেই ইউনিফর্ম পরে আছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীর ঘাড়, গলা ও কপাল বড় একটা স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা।

'তোমাদের কার্ড দেখি,' ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতটা পাতল রানা, ডান হাতের ল্যুগার দু'জনকেই কাভার দিচ্ছে। মইয়ের মাথায় লোকটার কথাও ভোলেনি, একটা চোখ রেখেছে সেদিকে।

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ইউনিফর্মের পকেট থেকে কার্ড বের করল শ্বেতাঙ্গিনী। কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেতে হলো। শ্বেতাঙ্গিনীর ঘাড়, গলা ও মুখের একটা অংশ অ্যাসিডে ঝলসানো। তবে পুরানো ক্ষত, অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। 'স্কার্ফটা সরাও, দাগগুলো আমি পরীক্ষা করব।'

'এটা অমানবিক,' শ্বেতাঙ্গিনীর পাশ থেকে বিড়বিড় করল নিগ্রো তরুণী।

তার কথায় কান না দিয়ে ধমক দিল রানা, 'কি হলো, স্কার্ফ খোলো!'

মাথা নিচু করে স্কার্ফ খুলে ফেলল শ্বেতাঙ্গিনী। দৃশ্যটা বীভৎস, কিন্তু রানার চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না। ঝাড়া পাঁচ-সাত সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর হাত তুলে তরুণীর ঘাড়ে, গলায় ও মুখের এক পাশে, ক্ষতের ওপর আঙুল বোলাল ও।

ডাক্টগুলোর কাছে ফিরে এল রানা। এদিকে কোন টেলিফোন বুদ নেই, কাজেই লিংকন বা স্যান্ডফোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। সিকিউরিটি অফিসাররা প্রতিটি বেযমেন্টের প্রবেশপথে ডিউটি দিচ্ছে, চিৎকার করলেও শুনতে পাবে না।

ডাক্টগুলো পরীক্ষা করল রানা। তারের জালে কান ঠেকালে বাতাসে ঊর্ধ্বগতি অনুভব করা যাচ্ছে। দুটো ডাক্ট তাজা বাতাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওপরে, বাকি দুটো ব্যবহৃত বাতাস ফিরিয়ে আনছে। ভাইরাস ছড়ানোর জন্যে এটাই আদর্শ জায়গা। কবীর

চৌধুরীকে শুধু ভাইরাস ভর্তি ফাইলটা ডাক্টের ভেতর খুলতে হবে, খুললেই বাতাসের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে অ্যাসেম্বলি হলে।

ঘড়িতে ন'টা পঁয়তাল্লিশ। সবুজ, সোনালি ও নীল অ্যাসেম্বলি হলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হতে যাচ্ছে।

র‍্যাকের কাছে আবার ফিরে এল রানা। প্রথমেই চোখে পড়ল মইটা নেই। মইটার সঙ্গে লোকটাও নেই।

মেয়ে দুটো কাছে চলে এসেছে। শ্বেতাঙ্গিনী আবার স্কার্ফ দিয়ে গলা, ঘাড় আর মুখের একটা পাশ ঢেকে ফেলেছে। রানার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে সে। 'লোকটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দিল অপর মেয়েটা। 'কি জানি, একটু আগে তো এখানেই ছিল।'

মেয়েটা থামতেই একটা প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লোকটাকে, অ্যালুমিনিয়ামের ভাঁজ করা মইটা বয়ে আনছে। 'কিছু বলবেন, স্যার?' দূর থেকেই জিজ্ঞেস করল সে।

'সন্দেহজনক কাউকে দেখলে চিৎকার দেবে,' বলে আবার ডাক্টগুলোর কাছে ফিরে এল রানা। ভাবছে, কবীর চৌধুরী আশপাশে কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে ভাইরাসের ফাইলটা তার কাছে নেই। সঙ্গে ভাইরাস থাকলে কিছু লেখার ঝামেলায় সে যেত না, জাল ভেঙে ডাক্টের ভেতর ঢেলে দিত ভাইরাস।

তারমানে ভাইরাস নিয়ে কেউ আসবে, তারই অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে আছে সে। এমনও হতে পারে রানা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে রানাকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। ছাদের ঠিক নিচেই বড় বড় শেলফ, প্রতিটি শেলফের মুখ অন্ধকার-শেলফ তো নয়, একেকটা টানেল। ওগুলোর ভেতর একশো লোক লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

grohon.com

একটা আওয়াজ পেল রানা। বাঁকের মুখে এসে উঁকি দিতেই দেখল দু'জন লোক চাকা লাগানো কাঠের বিরাট একটা বাক্স ঠেলে করিডরের এদিকেই এগিয়ে আসছে। বাক্সের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে: 'এ-প্লাস ব্যাংকুইট সাপ্লাই'।

'থামো।' এগিয়ে এসে বাক্সটার গতিরোধ করল রানা। 'তোমাদের ক্লিয়ার‍্যান্স কার্ড পরীক্ষা করব।' লোক দু'জন নিজেদের বুকের দিকে তাকাল। ঝুঁকে দুটো কার্ডই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। চেহারার সঙ্গে ফটোর মিল আছে। পুলিস ক্যাপটেন কি বলেছে মনে পড়ল রানার। ব্যাংকুইট সাপ্লাই নিয়ে একটা আউটফিটের আসার কথা আছে। 'ঠিক আছে, যাও তোমরা,' বলল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার তারা বিরাট বাক্সটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ তুলে করিডরের আরেক দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ রানা চিন্তা করল, পথে কোথাও সেই আউটফিটের কর্মচারীদের সরিয়ে কবীর চৌধুরীর লোকেরা বাক্সসহ কাভার্ড ভ্যানটা ছিনতাই করে থাকতে পারে। বাক্সের ভেতর হয়তো লুকিয়ে বসে আছে রক্তমাংসের প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড, হাতে ভাইরাসের ফাইল।

বন করে আধ পাক ঘুরতে গেল রানা। আর ঠিক তখনই দু'জনের একজন গুলি করল। ভোঁতা আওয়াজটা শুনল রানা, বুঝতে পারল পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে। এত কাছ থেকে গুলি লাগলে মানুষ বাঁচে না, পিঠ ভেদ করে হৃৎপিণ্ড ফুটো হবার কথা। রানা বাঁচল শুধু ঘুরে দাঁড়ানোয়। গুলিটা লাগল ল্যুগারে, জ্যাকেটের ভেতর শোল্ডার হোলস্টারে থাকায়। বুলেটের ধাক্কায় পিছু হটল, ভারী ল্যুগার পাঁজরে ডেবে যাওয়ায় প্রচণ্ড ব্যথায় সর্ষে ফুল দেখল চোখে। রানা ঢলে পড়ছে, এই সময় আবার গুলি করল লোকটা। দ্বিতীয় বুলেট ওর কপাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, চামড়া পোড়ার ব্যথা অনুভব করল ও। করিডরের মেঝেতে পড়ে থাকল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। গরম রক্ত বেরুচ্ছে কপাল থেকে। ইচ্ছে করে নয়, শক্তি না পাওয়ায় নড়ছে

না ও। মরে গেছে ভেবে নিজেদের পথে চলে যাচ্ছে লোকগুলো। প্রায় বন্ধ চোখের ভেতর থেকে রানা দেখতে পেল, কাজ ফেলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই তরুণী। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিটাও মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, এক চুল নড়ছে না।

রানা জ্ঞান হারায়নি, তবে বুঝতে পারছে ওকে অসুস্থ করে তুলছে কপালের জখমটা। শুধু বোধহয় চামড়া ছেঁড়েনি বা মাংস নিয়ে যায়নি, বুলেটটা সম্ভবত খুলির হাড়ও ভেঙে ফেলেছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল তিনবারের চেষ্টায়। করিডর ঘুরছে। মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকাল ও। স্থির হলো করিডর। ধীরে ধীরে দাঁড়াল, জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনল ল্যুগারটা। মেয়ে দুটো এগিয়ে আসছিল, সম্ভবত ওর সাহায্যেই, কিন্তু পিস্তল দেখে আবার পিছিয়ে গেল।

ল্যুগার পরীক্ষা করে হতাশ হলো রানা। বুলেটটা ট্রিগার আর রিলিজ ল্যাচ মুচড়ে দিয়েছে, ফলে জ্যাম হয়ে গেছে দুটোই। এই ল্যুগার এখন আর কোন কাজে আসবে না।

কাঁপা কাঁপা পায়ে এগোল রানা। বাক্স নিয়ে লোক দু'জন এরই মধ্যে বাঁক ঘুরেছে। রানার সঙ্গে এখনও খুদে গ্রেনেড আছে, কিন্তু ওগুলো ফাটালে কবীর চৌধুরীকেই সাহায্য করা হবে। বাক্সের বাইরে তার দু'জন লোক, ভেতরে কিয়াংশি থাকলে সে-ও, বিস্ফোরণে নির্ঘাত মারা যাবে। কিন্তু ভাইরাসের ফাইলটা যদি ওদের কারও কাছে থাকে, সেটা বিস্ফোরিত হবে, ডাক্ট হয়ে পৌঁছে যাবে অ্যাসেম্বলি হলে!

করিডরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উঁকি দিল রানা, বাঁকের ওদিকে তাকাল। ওদের একজন ইনটেক ডাক্টের স্ক্রীন এইমাত্র খুলল। কাঠের প্রকাণ্ড বাক্স থেকে বেরিয়ে আসছে কবীর চৌধুরীর জাপানি শিষ্য, রক্ত-মাংসের পাহাড়, কিয়াংশি। তার মস্ত হাতে ফাইলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। তৃতীয় লোকটা বাক্স থেকে বেরুতে সাহায্য করছে স্নেহপদার্থের ডিপোটাকে।

grohon.com

রানার একহাতে অকেজো ল্যুগার, অপর হাতে নগ্ন ছুরি। দেয়াল থেকে সরে এসে ছুরিটা ছুঁড়ল, যার হাতে ডাক্ট স্ক্রীনটা এখনও রয়েছে তাকে লক্ষ্য করে। কপালের হাড় চিরে গেঁথে গেল ইস্পাতের ফলা। লোকটা অকস্মাৎ আড়ষ্ট হলো, তারপর ঢলে পড়ল মেঝেতে, স্ক্রীনটা পড়ল তারই গায়ে। ইতিমধ্যে ল্যুগারটারও ডানা গজিয়েছে, ছোবল মারল দ্বিতীয় লোকটার দুই চোখের মাঝখানে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, মেঝেতে নিতম্ব দিয়ে পড়ল সে। কিয়াংশি, যাকে মূর্তিমান ও জলজ্যান্ত একটা ঘটনাই বলা যায়, মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো, ঘটনার একটা অংশ অর্থাৎ ডান পা এখনও বাক্সের ভেতর। রানা তার দিকে এগোল, সে-ও উৎসাহিত সরল শিশুর মত রানার দিকে হেঁটে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে না তাকিয়েও রানা অনুভব করল কয়েকজোড়া চোখ বাঁক থেকে দেখছে ওদেরকে।

কিয়াংশির মতলব হঠাৎ করেই বুঝতে পারল রানা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে ছুটল তার দিকে। আর ওকে ছুটতে দেখে কিয়াংশি সময় নষ্ট করল না, অবোধ শিশুর মত খলখল করে হেসে উঠে হাতের ফাইলটা ছুঁড়ে দিল খোলা ডাক্ট লক্ষ্য করে। কলেজে ফুটবল খেলার দিনগুলো স্মরণ করে শরীরটা মোচড়াল রানা, দিক বদলাল, তারপর লাফ দিল একই সঙ্গে ওপর দিকে ও পিছন দিকে।

রানা অনুভব করল উড়ন্ত ফাইলটার চারধারে ভাঁজ হলো আঙুলগুলো, মেঝেতে ছিটকে পড়ার সময় শক্ত করে ধরে থাকল শরীর থেকে যতটা সম্ভব দূরে। মেঝেতে ঠুকে গেল মাথা, হলুদ ফুলকি দেখতে পেল চোখের সামনে। পাহাড় এগিয়ে এসে লাথি মারল ওর বুকে। নিঃশ্বাস নয়, নাক দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে, ব্যথাটা এমন তীব্র মনে হলো। তবে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে রানা, ফাইল সহ শক্ত মুঠো মাথার ওপর ধরে আছে। ওকে গড়াতে দেখে ডাইভ দিল সুমো কুস্তিগির। ছ'শো পাউন্ড ওজন নিয়ে রানার ওপর পড়ল কিয়াংশি, যেন পিষে মেঝের সঙ্গে লেপ্টে

দেবে ওকে। রানার ওপর চেপে বসে বন্ধ মুঠোর নাগাল পেতে চাইছে কিয়াংশি। মুঠোয় ঢিল দিল রানা, ফাইলটা গড়িয়ে দিল মসৃণ মেঝেতে।

রানাকে ছেড়ে উঁচু হলো কিয়াংশি, ফাইলটা ধরার জন্যে ডাইভ দিতে গেল আবার। তখনও তার পা শূন্যে ওঠেনি, দু'হাত দিয়ে একটা পা আলিঙ্গন করল রানা; তারপর মোচড়াল। তার পতনের শব্দে কেঁপে উঠল করিডর। ব্যথায় গোঙাচ্ছে, সিধে হয়ে তার কাঁধে কারাতের প্রচণ্ড এক কোপ মারল রানা। একদিকে কাত হলো সে, তারপর হাতটা লম্বা করে ফাইলটার নাগাল পাবার চেষ্টা করল। কাছেই, উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে পড়ে রয়েছে ওটা।

ওখানে আগে পৌঁছাল রানার পা, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সবরি কলার মত মোটা মোটা আঙুলগুলো একেবারে থেঁতলে দিল, দু'একটা হাড়ও হয়তো ভেঙেছে। ব্যথায় কেঁদে ফেলল কিয়াংশি, সুর ও ভঙ্গি একদম শিশুর মতই। পায়ের একটা আঙুল দিয়ে ফাইলে টোকা দিল রানা, করিডরের মেঝেতে আবার সেটা গড়াতে শুরু করল।

কাঁদতে কাঁদতে সিধে হলো প্রকাণ্ড শিশু, অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে রানার দিকে ছুটে আসছে। রানার খুব ভাল করেই জানা আছে রক্ত-মাংসের ছুটন্ত এই ট্রেনের সঙ্গে মুখোমুখি লাগতে যাওয়াটা বোকামি। একেবারে শেষ মুহূর্তে শরীরটা বাঁকা করল রানা। সংঘর্ষ হলো না, স্রেফ ঘষা দিয়ে বেরিয়ে গেল কিয়াংশি। কিন্তু ওই সামান্য ঘষাই রানাকে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের গায়ে, মনে হলো সবগুলো হাড় গুঁড়িয়ে গেছে। গতির লাগাম টেনে স্থির হলো কিয়াংশি, সিদ্ধান্ত নিল রানাকে ধরবে নাকি ফাইলটা উদ্ধার করবে। মিশনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, ফাইলটার দিকে ছুটল সে, এখনও ফোঁপাচ্ছে। পাশ কাটাতে দেখে একটা পা বাড়াল রানা। পতনের শব্দে গোটা জাতিসংঘ ভবন কেঁপে উঠল। সবুট আরও একটা লাথি মারল রানা তার চোয়ালে। একটা গড়ান দিল সে,

চোখ পিটপিট করছে। 'বস্‌, ও বস্‌, বস্‌ গো...' করুণ সুরে প্রলাপ বকছে বা হয়তো বিলাপ করছে।

পিছন থেকে হাঁপানোর শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফেরাতেই দুই তরুণীকে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ওদের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে লোকটাও। মেয়ে দুটোর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। একজন হিসহিস করে বলল, 'মারুন, স্যার, দৈত্যটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলুন!'

'এই, এখানে কি!' ওদেরকে ধমক দিল রানা। 'যাও, মরতে না চাইলে পালাও এখান থেকে।'

ক্রল শুরু করল কিয়াংশি, ফাইলটার দিকে এগোচ্ছে। ছুটে গিয়ে আবার তার পাঁজরে লাথি মারল রানা। কিছুই হলো না, কিয়াংশির গতি যেন আরও বেড়ে গেল। ঘুরে তার সামনে চলে এল রানা, লক্ষ্যস্থির করে আবার লাথি মারল, এবার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। পরপর আরেকটা, তবে কিয়াংশি সেটা চিবুকে নিতে রাজি না হয়ে মাথা ঘোরাল, ফলে চোয়ালের চওড়া হাড় ফাটিয়ে দিল জুতোর ডগা। কিন্তু আসলে যে রানার কোন লাভ হচ্ছে না, সেটা বোঝা গেল অদ্ভুত এক কসরতের মাধ্যমে ওই শোয়া অবস্থা থেকে কয়েক মণ ভারী শরীরটা যখন লাফ দিল সামনের দিকে। নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। কিয়াংশির প্রকাণ্ড দুই হাত ওর পা জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। দড়াম করে পড়ে গেল রানা। পাথরের মত শক্ত মাথা ঘন ঘন ঠুকছে কিয়াংশি ওর বুকে, যেন পাঁজরের হাড়গুলো একটা একটা করে ভেঙে ফেলবে। মেঝেতে ঘষা খেয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা, প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু ক্রল করে ঠিকই ওকে নাগালের মধ্যে ধরে রাখছে কিয়াংশি। চাকা লাগানো কাঠের প্রকাণ্ড বাক্সটাকে পাশ কাটিয়ে আরও সামনে চলে এল ওরা। সুযোগ পেয়ে বুটের ডগা দিয়ে ফাইলটাকে আরও খানিক দূরে গড়িয়ে দিল রানা। কাজটা করতে এক সেকেন্ডেরও কম সময়

লাগল, কিন্তু সেই সুযোগেই কিয়াংশি ওর শরীরের ওপর তুলে ফেলেছে নিজেকে।

রানা আতংকিত। এই পাহাড় এখন সরায় কিভাবে! দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। কিয়াংশি কিছু করছে না, শুধু ওর ওপর শক্ত হয়ে চেপে আছে, তাতেই প্রাণ হারাবার যোগাড় হয়েছে রানার।

রানার গলায় একটা কনুই গাঁথার চেষ্টা করল কিয়াংশি। চোখ বিস্ফারিত, রানা দেখল ওদের দুই যোদ্ধার পিছু নিয়ে তরুণী দু'জনও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ভাব দেখে মনে হলো রানাকে উৎসাহ দিচ্ছে তারা। নিগ্রো মেয়েটা বাতাসে ঘুসি চালিয়ে রানাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, এভাবে মারলে কাজ হবে। তাদের পিছনে লোকটাকেও উঁকি দিতে দেখল।

বাঁচার আকুতি রানার শরীরে নতুন শক্তি এনে দিল। হাঁটু ভাঁজ করে কিয়াংশির সবচেয়ে নরম ও স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করল—প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যেমন মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না, তেমনি ওই একই কারণে পুরুষ মানুষের ওখানে মারলেও ভদ্রতার নিয়ম ভাঙা হয় না। কিয়াংশি যেন ইলেকট্রিক শক খেলো। গড়ান দিল সে, দু'হাতে উরু সন্ধি চেপে ধরেছে, চিৎ হয়ে আছে যেন ডায়নোসরদের সমসাময়িক একটা ব্যাঙ।

বাতাসের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে এখনও, ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। হঠাৎ খেয়াল করল, মেইনটেন্যান্স-এর লোকটাকে নিয়ে এগিয়ে আসছে দুই তরুণী।

'না, বস্‌; না!' কেঁদে ফেলল কিয়াংশি। ঘুরতে যাবে রানা, সচল পাহাড়ের মত ছুটে এসে রানাকে ধরল সে, প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল মাথার ওপর। ব্যথায় নাকি উল্লাসে বলা মুশকিল, কাঁদছে নাকি হাসছে তাও বোঝা গেল না, অদ্ভুত একটা কলকল খলখল শব্দ বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে। 'যিশুর কসম লাগে, দেখুন আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারি কিনা!'

কিয়াংশির মাথার ওপর রয়েছে রানা, কোথায় ভুল করে

grohon.com

ফেলেছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে চৈতন্য হারাবার অবস্থা হলো ওর। এবার নিয়ে তিনবার 'বস'কে সম্বোধন করল কিয়াংশি! মেইনটেন্যান্স-এর লোকটার হাসি হাসি মুখ ছিল সেই সম্বোধনের প্রতিক্রিয়া! কিন্তু এখন কিছু করার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোরও সময় পাওয়া গেল না। কিয়াংশি, কবীর চৌধুরীর শিষ্য, মাথার ওপর থেকে ওকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল।

হাড় ভাঙল কি দেয়াল ভাঙল, সে প্রশ্ন অবান্তর। রানার জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে ও। ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড বোধহয় ফেটে গেছে। আর দাঁত যে ভেঙেছে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। চোখ মেলতে ওই রক্তই প্রথমে দেখতে পেল রানা। তারপর অন্ধকার পর্দাটা আরও হালকা হয়ে এল। মেঝেতে পড়ার পর সময় পার হয়েছে এক থেকে তিন সেকেন্ড। তবে এরইমধ্যে ফাইলটার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে কিয়াংশি।

মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে রানা। সিধে হলো, টলতে টলতে হাঁটা ধরল উল্টো দিকে। করুণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মেয়ে দুটো। তাদেরকে পাশ কাটাল রানা। মেইনটিনান্স-এর কর্মীর ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি। তাকেও নিঃশব্দে পাশ কাটাল রানা। আরও কয়েক পা এগিয়ে থামল ও, পাশেই পড়ে রয়েছে কপালে ছুরি গাঁথা লাশ। তারপর ঘুরল রানা।

ফাইল মেঝে থেকে কুড়াল কিয়াংশি। শিশুর সরল হাসি ফিরে এল মুখে। মুখ তুলে দুই তরুণী আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দিকে তাকাল। হাতের ফাইল দেখাল সে। 'এবার কি বোনাস না দিয়ে পারবেন, বস্?' পরমুহূর্তে ছুটল সে। ছুটে ফিরে আসছে ডাক্টের দিকে।

ঝুঁকল রানা, ছুরিটা ধরে টানল, তারপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল কিয়াংশিকে লক্ষ্য করে–সে তখন ডাক্ট থেকে মাত্র এক পা দূরে।

কিয়াংশির বাম বুকে বিঁধল ছুরি, মাংসের ভেতর ফলার এক চুলও বোধহয় ঢুকতে বাকি নেই। অকস্মাৎ নিগ্রো মেয়েটার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল, চিৎকার করে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, বস্! আর তো সহ্য করা যায় না!'

রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিগ্রো তরুণী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, বসের নির্দেশ পাবার আশায়, রানাকে যখন দেখতে পেল ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পিস্তলটা হাতে আসতেই রানা দেখল মেইনটেন্যান্স কর্মী ইউনিফর্মের পকেট থেকে ভারী একটা রিভলভার বের করছে। প্রথমে সরাসরি তার বুকে, তারপর নিগ্রো তরুণীর মাথায় পরপর দুটো গুলি করল রানা। তারপর ঝট করে শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে তাকাল।

আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। প্রবলবেগে মাথা নাড়ছে।

রানা দেখল ডাক্টের পাশে, দাঁড়িয়ে টলছে কিয়াংশি, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে প্রকাণ্ড মুখ। ছুরির হাতলটা ধরল সে, চোখ বুজল, টান দেয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ছুটল রানা।

হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা শরীর থেকে খুলে ফেলল কিয়াংশি।

উড়ে এসে তার গায়ে পড়ল রানা।

হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে কিয়াংশি, তার আলগা মুঠো থেকে ফাইলটা কেড়ে নিল রানা, তারপর ডান হাতের পিস্তলটা নামিয়ে আনল প্রকাণ্ড মাথার মাঝখানে।

কিয়াংশি পড়ে যাচ্ছে, আধপাক ঘুরে পিছন দিকে তাকাল রানা।

মেয়েটা করিডরে নেই!

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শক্তিশালী এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে রানার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। অকস্মাৎ সচল হলো প্রকাণ্ড কাঠের

grohon.com

বাক্স। বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা, বাক্সের আড়ালে ওটা আসলে একটা আর্মারড্ কার। কাঠের আবরণ খসিয়ে দিল শ্বেতাঙ্গিনী ড্রাইভার। উইন্ডস্ক্রীন নেই, তার বদলে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা সরু ফাটল। ভেতরে আলো জ্বলছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে রানা দেখল, ফাটলের ভেতর আর্মারড্ কারের হুইলটা এক হাতে ধরে রয়েছে শ্বেতাঙ্গিনী। অপর হাত দিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল স্কার্ফ, এবং তার সাথে রাবারের মুখোশটাও। এ কবীর চৌধুরীর নিজস্ব আবিষ্কার; কিন্তু দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই যে ধরে।

বিস্ময়ের এই ধাক্কাটা জীবনে কখনও ভুলবে না রানা।

সবার আগে পৌছলেন রাহাত খান। মনিটরে সেনসরটাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল হতে দেখে যা বোঝার বুঝে নেন তিনি, স্যান্ডফোর্ডকে খবর পৌছে দিয়ে নিজেও রওনা হন তৃতীয় বেযমেন্টের উদ্দেশে। তাঁর সঙ্গেই পৌছাল, একটা মিছিলের মত, বিশ-পঁচিশজন সিআইএ এজেন্ট, এবং সিআইএ চীফ স্যান্ডফোর্ড।

ইতিমধ্যে তিনবার রানাকে গাড়ির তলায় ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে কবীর চৌধুরী।

করিডরে লুকাবার বা গা বাঁচাবার কোন জায়গা নেই। তবে চেষ্টা ও বুদ্ধি থাকলে উপায় একটা না একটা বেরোয়ই। কবীর চৌধুরীর হাতিয়ার দিয়েই কবীর চৌধুরীকে ঠেকিয়েছে রানা।

গুলি করে কোন লাভ হয়নি, আর্মারড্ কারের ইস্পাতের বডি ফিরিয়ে দিয়েছে ওগুলো। রানা ছুটে এসে আড়াল নিয়েছে নরম পাহাড়ের পিছনে। কবীর চৌধুরী কিয়াংশির ওপর দিয়েই গাড়ি চালাল, তবে বাধাটা টপকাতে সময় লাগল তার, আর সেই সুযোগে সরে এল রানা।

কোণঠাসা হয়ে পড়লে কিভাবে পালাবে আগেই তা ঠিক করা ছিল, তা না হলে ভিড়টা দেখামাত্র আর্মারড্ কারটা সরাসরি দেয়ালের দিকে চালাত না।

দেয়াল ভেঙে আরেকটা করিডরে বেরিয়ে গেল কার, সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে নিচতলায়। পথে তাকে অনেক বাধার সামনে পড়তে হবে, সন্দেহ নেই। তবে সম্ভাব্য বাধার কথা কি আর চিন্তা করেনি! তা না হলে ওর নাম কবীর চৌধুরী হবে কেন!

ছুটে এসে রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাহাত খান, 'ওয়েল ডান, মাই সান, ওয়েল ডান!'

রানার একটু সন্দেহ হলো, বুড়ো কাঁদছে নাকি!

এটা একটা গবেষণারই বিষয় ছিল, কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল না। স্যান্ডফোর্ডের হাতে ফাইলটা ধরিয়ে দিতেই স্ট্রেচার নিয়ে পৌছে গেল সাত-আটজন হসপিটাল কর্মী ও ডাক্তার।

অ্যামবুলেন্সে করে হাসপাতালে যাচ্ছে রানা, সিদ্ধান্ত নিল ইভাকে নিউ ইয়র্কে ডেকে পাঠাবে। দেখা যাক ওর সঙ্গে ছুটিটা জমে কিনা।

মনে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে। কবীর চৌধুরী কি সত্যি পালিয়ে যেতে পেরেছে?

***

Grohon // Adhare Alor Pothojatri
Grohon
Adhare Alor Pothojatri